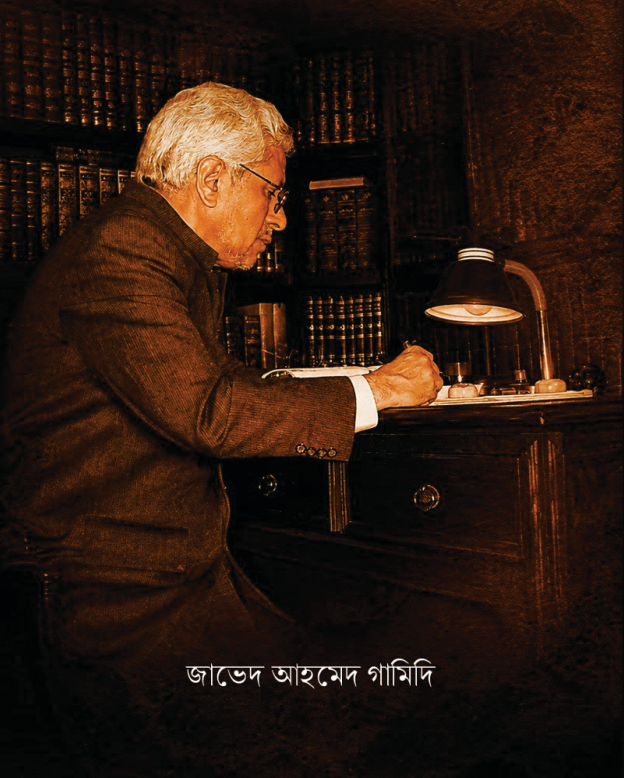


# সত্যের আহ্বান

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

(আল্লাহর নিকট ধর্ম কেবল ইসলাম)



জাভেদ আহমেদ গামিদি

সত্যের আহ্বান



# সত্যের আহ্বান

জাভেদ আহমেদ গামিদি

বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা

ইমদাদ হোসেন

মাওলানা উমর ফারুক

আল-মাওরিদ

জ্ঞান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান



# সূচিপত্র

আমাদের আহ্বান ৯

খোদাতায়ালার ওপর ঈমান ১৫

মূলনীতি ৪৪

সত্য ধর্ম ৫১

ইসলাম ও রাষ্ট্র ৯১

নাহি আনিল মুনকার ১১৬



## মুখবন্ধ

ইসলাম আল্লাহতায়ালার মনোনীত ধর্ম। এই ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা কী? এই পুস্তিকাটি মূলত তারই বিবরণ এবং এই ব্যাখ্যার দিকে আহ্বান জানাতেই রচিত হয়েছে। এই পুস্তিকাতে যে লেখাগুলো সংকলিত হয়েছে, তা সংক্ষেপে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ ফুটিয়ে তোলে, যার বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আমরা আমাদের ‘মিজান’ বইয়ে উপস্থাপন করেছি। এর উদ্দেশ্য: বর্তমান যুগে ইসলামের দাওয়াতের জন্য এই ব্যাখ্যা সাধারণ মানুষ থেকে জ্ঞানী-গুণী নির্বিশেষে সবার নিকট পৌঁছে দেওয়া।

খিজির দেখিয়েছিল যে পথ, তাতে ঝরনা ছিল বহুদূরে,  
তীব্র তৃষ্ণাই নতুন পথের সন্ধান দিল মোদের অন্তরে।

— জাভেদ

ডালাস, যুক্তরাষ্ট্র

৭ জুন ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ



## আমাদের আহ্বান

ধর্ম আল্লাহতায়ালার হেদায়েত, যা তিনি প্রথমত মানুষের সহজাত প্রকৃতিতে গেঁথে দিয়েছেন, এরপর তার বিস্তারিত বিবরণ নিজের নবীদের মাধ্যমে মানুষকে দিয়েছেন। নবীদের মাধ্যমে ধর্মের প্রয়োজনীয় সকল বিবরণ প্রদানের যে সিলসিলা চলমান ছিল, সেই সিলসিলার শেষ নবী হলেন: মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। সুতরাং ধর্মের একমাত্র উৎস এখন তার মহান ব্যক্তিসত্তা ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি নিজের কথা, কাজ ও মৌনসম্মতির মাধ্যমে যে বিষয়গুলোকে ধর্ম হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, সেগুলোই সত্য ধর্ম।<sup>[১]</sup>

দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে আমরা এই ধর্মের ওপর ঈমান আনতে এবং এই মোতাবেক

---

<sup>১</sup> কুরআন, সূরা জুমুআ, ৬২:২।

নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের পরিশুদ্ধির আহ্বান জানাই। যারা এই আহ্বান কবুল করবে, তাদের প্রতিদান আল্লাহর জান্নাত, যার প্রশস্ততা পুরো মহাবিশ্বের প্রশস্ততার সমান; যেখানে জীবনের সাথে মৃত্যু, আনন্দের সাথে বেদনা, খুশির সাথে দুঃখ, প্রশান্তির সাথে অস্থিরতা, আরামের সাথে কষ্ট এবং নিয়ামতের সাথে আজাবের কোনো চিন্তা নেই; যার আরাম স্থায়ী, যার স্বাদ অসীম, যার দিন-রাত চিরন্তন, যার নিরাপত্তা অবিনশ্বর, যার আনন্দ অক্ষয়, যার সৌন্দর্য চিরস্থায়ী এবং পূর্ণতা সীমাহীন। আল্লাহ-তায়াল্লা তাঁর বান্দাদের জন্য এতে এমন কিছু প্রস্তুত রেখেছেন, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মানুষের হৃদয় তা কখনো কল্পনাও করেনি।<sup>[২]</sup>

বর্তমানে যারা এই ধর্ম মেনে চলছেন, আমরা তাদের আহ্বান জানাই: আল্লাহর এই জান্নাতে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভের জন্য তারা যেন নিজেদের কাজ-কর্মকে নিজেদের ঈমানের

---

<sup>২</sup> কুরআন, সূরা আলা, ৮৭:১৪-১৭।

অনুরূপ বানিয়ে নেন। আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের হক পূর্ণ সততা ও পূর্ণ ইখলাসের সাথে আদায় করেন এবং কারো জান-মাল ও ইজ্জত নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি না করেন।<sup>[৩]</sup>

আমরা তাদের আহ্বান জানাই: নিজেদের পরিবেশে, নিজেদের কর্মক্ষেত্রে তারা একে অপরকে ভালোর উপদেশ দেবেন এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবেন। এটি সেই ফরজ কাজ, যা তাদের প্রতিপালক তাদের ওপর দায়িত্ব হিসেবে অর্পণ করেছেন। এই ফরজ পিতার জন্য সন্তানের প্রতি এবং সন্তানের জন্য পিতার প্রতি; স্বামীর জন্য স্ত্রীর প্রতি এবং স্ত্রীর জন্য স্বামীর প্রতি; ভাইয়ের জন্য বোনের প্রতি এবং বোনের জন্য ভাইয়ের প্রতি; বন্ধুর জন্য বন্ধুর প্রতি এবং প্রতিবেশীর জন্য প্রতিবেশীর প্রতি; অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি এই ফরজটি পালন করবেন। সুতরাং তারা যখন দেখবে, তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট এই ব্যক্তিদের কেউ সত্যবিরোধী পথ অবলম্বন করেছে, তখন তাদের

---

<sup>৩</sup> কুরআন, সূরা নাহল, ১৬:৯০।

উচিত নিজেদের জ্ঞান, নিজেদের মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী তাকে সত্য পথ অবলম্বনের উপদেশ দেওয়া।<sup>[৪]</sup>

ধর্ম ও দুনিয়ার কোনো বিষয়ে তাদের আবেগ, গোঁড়ামি, স্বার্থ ও কামনা-বাসনা যদি তাদেরকে ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত করতে চায়, তবে তারা যেন সত্য ও ন্যায়ের ওপর অটল থাকেন; এমনকি যদি সত্যের সাক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে, তবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও যেন তারা সেই দাবি পূরণ করেন। তারা সর্বদা সত্য কথা বলবেন, সত্যের সামনে মাথা নত করবেন, ন্যায়ের সাক্ষ্য দেবেন এবং নিজেদের বিশ্বাস ও কর্মে ন্যায়বিচার ছাড়া অন্য কিছু কখনোই গ্রহণ করবেন না।<sup>[৫]</sup>

তাদেরকে যদি ধর্মীয় নির্যাতনের (persecution) লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়, তবে সহিংসতার জবাবে সহিংসতার পথ অবলম্বনের

---

<sup>৪</sup> কুরআন, সূরা তওবা, ৯:৭১।

<sup>৫</sup> কুরআন, সূরা নিসা, ৪:১৩৫; মায়েরা, ৫:৮।

পরিবর্তে ধৈর্য ধারণ করবেন<sup>[৬]</sup> এবং সম্ভব হলে যেখানে সহিংস পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, সে স্থান ছেড়ে এমন স্থানে হিজরত করবেন, যেখানে তারা প্রকাশ্যে নিজেদের ধর্ম পালন করতে পারেন।<sup>[৭]</sup>

মাদরাসা-এ-ফারাহির শ্রেষ্ঠ আলেমগণ আল্লাহর তাওফিকে বর্তমান যুগে সত্য ধর্মকে ‘ফিকহ’, ‘কালাম’, ‘দর্শন’ ও ‘তাসাউফ’-এর সমস্ত মিশ্রণ থেকে আলাদা করে কোনো রকম হেরফের ছাড়াই কুরআন ও সুন্নাতের ভিত্তিতে পেশ করেছেন। এই ধর্মের প্রচার-প্রসার, এই ধর্ম মোতাবেক মানুষের তালিম ও তারবিয়াত তথা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং এর আলোকে মুসলমানদের ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন সত্যিকার অর্থেই বড় জিহাদ। আমরা তাদের আহ্বান জানাই: নিজেদের সমর্থন, নিজেদের সময় এবং নিজেদের সামর্থ্য দিয়ে তারা এই জিহাদে আমাদের সাহায্য করবেন। এই সাহায্য মূলত

---

<sup>৬</sup> কুরআন, সূরা হামিম সাজদা, ৪১:৩৩-৩৫।

<sup>৭</sup> কুরআন, সূরা নিসা, ৪:৯৭।

আল্লাহর সত্য ধর্মকেই সাহায্য করা। একজন মুমিন বান্দার কাছে আল্লাহর সত্য ধর্মকে সাহায্য করার চেয়ে আর কিছুই প্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না।<sup>[৮]</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ  
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِّلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى  
اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ.

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও, যেমন ঈসা ইবনে মরিয়ম তার সহচরদের বলেছিলেন: ‘আল্লাহ-তায়ালা পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে?’ সহচরগণ জবাবে বলে: ‘আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী।’” (কুরআন, সূরা সফ, ৬১:১৪)



<sup>৮</sup> কুরআন, সূরা তওবা, ৯:২৪।

## খোদাতায়ালার ওপর ঈমান

মানুষ হলো সৃষ্টজীব (মাখলুক)। ধর্মের মূল বক্তব্য এই সত্যের উপলব্ধি থেকেই শুরু হয়। এটি এক অস্তিত্বগত বাস্তবতা, যা আমরা যখন খুশি নিজ চোখে পর্যবেক্ষণ করতে পারি। আমরা জানি, মানুষের সৃষ্টি কোন ধরনের প্রাণহীন উপাদান দিয়ে হয়। আমাদের খাদ্যের মাধ্যমে এগুলো কোথায় এবং কোন কারখানায় (Factory) যায়। আমরা জানি, এগুলোর মধ্যে মানুষের কোনো বীজ থাকে না এবং এমন কোনো জিনিসও থাকে না, যা পদার্থকে জীবনে এবং জীবনকে চেতনায় রূপান্তর করতে পারে। কিন্তু এই খাদ্যই যখন একটি বিশেষ স্থানে পৌঁছায়, তখন তা সেই বীর্ষে পরিণত হয়, যার মধ্যে মানুষ হয়ে ওঠার যোগ্যতাসম্পন্ন বীজ বিদ্যমান থাকে। একজন পুরুষের দেহ থেকে একই সময়ে যে পরিমাণ বীর্ষ নির্গত হয়, তাতে লক্ষ লক্ষ ও কোটি

কোটি বীজের অস্তিত্ব থাকে। এগুলোর প্রতিটি এই সক্ষমতা রাখে যে, তা যদি নারীর ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়, তবে তা পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হবে। নারীর এই ডিম্বাণুগুলোও একইভাবে অন্য একটি কারখানায় (Factory) তৈরি হয়। আমরা দেখতে পাই, বীর্ষ যখন ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়, তখন শুরুতে যা অস্তিত্ব লাভ করে, তা এতই ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা দুষ্কর। অথচ এই তুচ্ছ বস্তুরই বিবর্তন ঘটে; নয় মাস কয়েক দিনের ব্যবধানে এক ফোঁটা পানি থেকে তা রক্তপিণ্ডে, রক্তপিণ্ড থেকে মাংসপিণ্ডে এবং মাংসপিণ্ড থেকে হাড় ও হাড়ের ওপর মাংসের আবরণে সজ্জিত সম্পূর্ণ এক ভিন্ন সত্তায় রূপান্তর লাভ করে মায়ের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে। অতঃপর এই পৃথিবীতে সে তার বিস্ময়কর শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে জ্ঞান-যুক্তি, বুদ্ধি-প্রজ্ঞা এবং শিল্প-শৈলীর এমনসব উৎকর্ষ প্রদর্শন করে, যা আজ জগতের সর্বত্র দৃশ্যমান।

আমরা এই সৃষ্টিকে দেখি এবং আমাদের চেতনার গঠনের কারণেই আমরা এর স্রষ্টাকে খুঁজতে বাধ্য হই। প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা থাকতে

হবে— বিষয়টি এমন নয়, বরং প্রতিটি ‘সৃষ্টির’ একজন স্রষ্টা থাকতে হবে। এই ‘সৃষ্টি নামক কর্মই’ আমাদেরকে এই অনুসন্ধান বাধ্য করে। আমরা এই সহজাত তাড়না নিয়েই জন্মেছি। তাই আমরা কখনো কার্যের জন্য কারণ এবং কর্মের জন্য কর্তার অনুসন্ধান বাদ দিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। দর্শন, বিজ্ঞান এবং সুফিবাদের মহীৰুহদের একে একে দেখে নিন, কেউই এ থেকে বিমুখ থাকতে পারেননি। সুতরাং জ্ঞানের পুরো ইতিহাস এই বাস্তবতার স্বীকৃতির ইতিহাস যে, প্রতিটি সৃষ্টির একজন স্রষ্টা আছেন; মানুষ সৃষ্টি, অতএব মানুষেরও একজন স্রষ্টা আছেন।

শুধু তাই নয়, আমরা এটাও জানি যে, সৃষ্টির যে কর্ম আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি, তা সুচিন্তিত এবং এর প্রতিটি অংশে অসীম ক্ষমতা, অনন্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটেছে। আমরা যেমন সৃষ্টিকে অস্বীকার করতে পারি না, তেমনি এই কর্মের প্রকৃতিকেও অস্বীকার করতে পারি না। কারণ, এই কর্মের প্রকৃতিও ঠিক তেমনই এক বাস্তবতা, যেমন সৃষ্টির কর্ম একটি বাস্তবতা। আমরা যেভাবে কর্ম পর্যবেক্ষণ করি, ঠিক

সেভাবেই এই বাস্তবতাকেও পর্যবেক্ষণ করি। সুতরাং আমরা এ কথা স্বীকার করতেও বাধ্য যে, মানুষের স্রষ্টা ইচ্ছাশক্তির অধিকারী, তাঁর ক্ষমতা অসীম এবং তিনি মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

মানুষের বুদ্ধি তাকে এই পর্যন্ত নিয়ে আসে। এই সফরে তার বাহির থেকে কোনো নির্দেশনার প্রয়োজন হয় না। জ্ঞান ও উপলব্ধির যে সক্ষমতা মানুষকে তার জন্মের সাথে দান করা হয়েছে, সেটি-ই এই সফরে পথ দেখানোর জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এর পরের প্রশ্ন হলো: সেই স্রষ্টা কে? এই প্রশ্নের উত্তর মানুষের বুদ্ধি এমন অকাট্য নিশ্চয়তা ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দিতে পারে না। তাই সে সাধারণত ওই দুটো উত্তরের দিকে তাকায়, যা মানবজাতির পুরো ইতিহাসে এ যাবৎকাল পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। ওই দুটো উত্তর থেকে সে যেকোনো একটি বেছে নেয়; অথবা দুটোর মাঝে দোদুল্যমান থাকে।

প্রথম উত্তরটি হলো, মানুষ যে মহাবিশ্বের কোলে চেতনার চোখ খোলে, সেই মহাবিশ্বই তার স্রষ্টা। এটি নাস্তিক্যবাদের উত্তর।

প্রথম উত্তরের ব্যাখ্যা সাধারণত এভাবে করা হয় যে, মহাবিশ্বের নিজস্ব চেতনা আছে, ফলে মহাবিশ্বের অভ্যন্তরেই এমন এক শক্তি বিদ্যমান, যা তার সত্তাগত দিক থেকে ‘সৃষ্টিকর্তা’। মহাবিশ্বের বাইরে আর কিছু নেই, এমনকি ভেতর ও বাইরের পার্থক্যটুকুও মহাবিশ্বের ভেতরেই সীমাবদ্ধ। মহাবিশ্বের প্রতিটি অংশ একদিকে যেমন তার অভ্যন্তরীণ সত্তা, অন্যদিকে তার বাহ্যিক প্রকাশও বটে। এটি কার্যকারণ সম্পর্কের এক বিশাল কারখানা হতে পারে, তবে সামগ্রিক বিচারে এটি নিজেই নিজের চূড়ান্ত কারণ (Ultimate Cause)।

এই উত্তরটি নিছক একটি দাবি।

প্রথমত এই কারণে যে, এতে মহাবিশ্বের যে নিজস্ব চেতনার দাবি করা হয়েছে, তার কোনো প্রমাণ আমাদের পর্যবেক্ষণে কখনো আসেনি। আমরা জানি, মহাবিশ্বের মূল সত্তা হলো পদার্থ (Matter), আর পদার্থের কোনো ইচ্ছাশক্তি নেই। এমনকি পদার্থের জ্ঞান ও বুদ্ধিও নেই। জ্ঞান, বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির মতো গুণগুলো যদি

কোথাও কোনো মাত্রায় পাওয়া যায়, তবে তা সেই ‘সৃষ্টির’ মাঝেই পাওয়া যায়, যার স্রষ্টা হিসেবে এই মহাবিশ্বকে দাবি করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, কোনো কিছুকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ক্ষমতাও যদি কোথাও কোনো পর্যায়ে থেকে থাকে, তবে তা সেই ‘সৃষ্টি’র মাঝেই রয়েছে, যাকে ছাড়া জ্ঞান, বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি সবই অর্থহীন।

দ্বিতীয়ত এই কারণে যে, মহাবিশ্বের যে শক্তির বহিঃপ্রকাশকে ভুল করে ‘সৃষ্টিকর্ম’ মনে করা হয়, তা আসলে জড় পদার্থের সহজাত বৈশিষ্ট্য এবং তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল মাত্র। শক্তির এমন প্রকাশ তো মানুষের তৈরি প্রতিটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের কলকজাতেও দেখা যায়; যার চরম উৎকর্ষ বর্তমানে ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’ (Artificial Intelligence) রূপে আমাদের প্রত্যেককে প্রতিনিয়ত বিস্মিত করছে।

তৃতীয়ত এই কারণে যে, মহাবিশ্বের সামগ্রিকতা বলে যদি কিছু থাকে, তবে তা সেইসব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্যেরই সমষ্টি, যেগুলো তার মধ্যে কার্যকারণের সম্পর্ক তৈরি

করে। এর সাথে সৃষ্টির সেই মহান কার্যের কোনো দূরতম সম্পর্কও নেই, যা প্রতিটি পদে পদে জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিপ্রায় এবং সৃজনশীল ক্ষমতার দাবি রাখে। এটি নিছক উপায়-উপকরণ, কর্মপদ্ধতি আর প্রাকৃতিক নিয়মের একটি জগৎ; এর বাইরে এর কোনো স্বতন্ত্র বা অতিপ্রাকৃত মর্যাদা নেই।

‘মানুষের স্রষ্টা কে?’ এই প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তরটি দিয়েছেন তারা, যারা নিজেদের ‘নবী’ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। মানুষকে এই উত্তর তার সৃষ্টির একদম শুরুতেই প্রদান করা হয়েছিল। ফলে প্রথম মানুষটি যেভাবে প্রথম মানুষ ছিলেন, ঠিক তেমনি তিনি প্রথম নবীও ছিলেন। এ বিষয়ে পরবর্তীকালে আমরা যেসব বিস্তারিত তথ্য জানতে পারি, তার সারকথা হলো: মানুষের স্রষ্টা এই মহাবিশ্বের ঊর্ধ্বে বিদ্যমান এক পরম জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময় সত্তা। মানুষের সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল মাটির গভীরে। মাটির যে উপাদানগুলো বর্তমানে খাদ্যের মাধ্যমে আমাদের দেহে প্রবেশ করে এবং এক বিন্দু তুচ্ছ জলীয় নির্যাসের রূপ নিয়ে মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু করে, ওই সময়ে সেগুলো পচা কাদার

ভেতরে ঠিক একইভাবে এক বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। দৈহিক কাঠামো পূর্ণতা না পাওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এক পর্যায়ে কাদার উপরিভাগ শুকিয়ে পোড়ামাটির মতো ঠনঠনে শক্ত মাটিতে পরিণত হয়। অতঃপর তা বিদীর্ণ হয়ে সেখান থেকে আত্মপ্রকাশ করে এক জীবন্ত প্রাণী, যাকে মানুষের জৈবিক সত্তা বা প্রাণিসত্তা বলা উচিত। অতঃপর মাটির গভীরে যে প্রক্রিয়া ঘটেছিল, জ্ঞান ও উপলব্ধিহীন এই অপরিপক্ব প্রাণীর ভেতরেও ঠিক একই প্রক্রিয়া শুরু হয়। এরপর তাকে সব দিক থেকে সুবিন্যস্ত করা হয় এবং নিখুঁত রূপ দেওয়া হয়; এক পর্যায়ে সে এই যোগ্যতা অর্জন করে যে, তাকে মানুষের ‘ব্যক্তিত্ব’ দান করা যাবে। পরিশেষে, এক সূক্ষ্ম ফুৎকারের মাধ্যমে তাকে সেই ব্যক্তিত্ব দান করা হয়, যা আমাদের চেনা মানবজাতির সৃষ্টির চূড়ান্ত ধাপ হিসেবে চিহ্নিত।

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ  
نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ

وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ  
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾

“মানুষের সৃষ্টির সূচনা তার স্রষ্টা করেছিলেন মাটি থেকে; অতঃপর এক তুচ্ছ তরলের নির্যাস থেকে তিনি তার বংশধারা চালু করেছেন। এরপর তিনি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুবিন্যস্ত ও সুশোভিত করেছেন এবং তার ভেতরে ফুঁকে দিয়েছেন নিজের রুহ। আর তিনি তোমাদের দিয়েছেন (শোনার জন্য) কান, (দেখার জন্য) চোখ এবং (উপলব্ধির জন্য) অন্তর; অথচ তোমরা খুব সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।”  
(কুরআন, সাজদা, ৩২:৭-৯)

এই উত্তরটি সর্বশেষ যে মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে, তা হলো এই কুরআন, যার আয়াতসমূহ ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে। যে নবী এটি উপস্থাপন করেছেন, তার দাবি হলো: এটি স্রষ্টার নিজস্ব কালাম, যা তার ওপর নাজিল করা হয়েছে। যেভাবে তা নাজিল হয়েছে, ঠিক সেভাবে তিনি তা মানুষকে পাঠ করে শুনিয়েছেন। এতে একটি অঙ্কর বা চিহ্নের পরিবর্তন না তিনি করেছেন,

আর না কিয়ামত পর্যন্ত কেউ এটা করার দুঃসাহস দেখাতে পারবে।

তাই ঘোষণা করা হয়েছে: তোমরা যদি কুরআনকে আল্লাহর কিতাব মনে না করো, তবে এর হেদায়েত, বিষয়বস্তু এবং বর্ণনাভঙ্গির বিচারে এটি যে মানের বাণী, সেই মানের অন্তত একটি মাত্র সুরাও তৈরি করে পেশ করো, যদি তোমরা তোমাদের এই ধারণায় সত্যবাদী হয়ে থাকো:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا  
بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ  
اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

“যদি এ বিষয়ে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে, তবে (যাও এবং) এর মতো কেবল একটি সুরা তৈরি করে নিয়ে আসো; (আর এ কাজের জন্য) আল্লাহ ছাড়া তোমাদের যত সাহায্যকারী আছে, তাদের সবাইকে ডেকে নাও, যদি তোমরা তোমাদের এই দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকো।” (কুরআন, বাকারা, ২:২৩)

কুরআনে এই দাবিটি একাধিক স্থানে বর্ণিত হয়েছে এবং এর পাশাপাশি অত্যন্ত স্পষ্ট একটি মানদণ্ডও দেওয়া হয়েছে, যার ভিত্তিতে আমরা ফয়সালা করতে পারি যে, কুরআন আসলেই স্রষ্টার কালাম, নাকি কোনো মানুষ নিজে রচনা করে এটাকে স্রষ্টার সাথে সম্পৃক্ত করেছে?

সেই মানদণ্ড কী? নিচের তিনটি পয়েন্টে আমরা সেটাকে উপস্থাপন করতে পারি:

প্রথমত, মানুষ যে জ্ঞানই সৃজন করুক না কেন, শব্দ ও অর্থ উভয় দিক থেকেই তাকে ‘ভুল ও সংশোধন’ (Trial and Error)-এর বহু ধাপ পার করতে হয়। জন্মের প্রথম দিনেই কেউ সক্রোটাস বা প্লেটো হয়ে যায় না; রাতারাতি কেউ গালিব, শেক্সপিয়ার কিংবা নিউটন ও আইনস্টাইন হয়ে ওঠে না। বরং মানুষ শেখে, উপলব্ধি করে এবং শেখার প্রতিটি ধাপে ভুল করে আবার তা সংশোধনও করে। আমরা দেখতে পাই, মানুষ বছরের পর বছর ধরে তার পূর্বসূরিদের জ্ঞান আহরণ করে, তা নিয়ে নিরন্তর চর্চা ও সাধনা চালায় এবং ধাপে ধাপে উন্নতির দিকে এগিয়ে

যায়; পরিশেষে তার হাত ধরে জ্ঞান বা সাহিত্যের কোনো কালজয়ী সৃষ্টির আত্মপ্রকাশ ঘটে। এটিই মানুষের চিরায়ত নিয়তি এবং এভাবেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। জ্ঞান ও সাহিত্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এর কোনো ব্যতিক্রম কখনো পরিলক্ষিত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও তেমন কিছু কল্পনা করা যায় না।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো: কুরআন এই সর্বজনীন নিয়মের এক অনন্য ব্যতিক্রম। এটি যার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, সেই মহান ব্যক্তি কয়েকশ ঘরের এক ক্ষুদ্র জনপদে দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে নিজ জাতির চোখের সামনেই দিন-রাত অতিবাহিত করেছেন। এই দীর্ঘ সময়ে তার প্রতিটি কর্মকাণ্ড সকলের কাছে ছিল সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও দৃশ্যমান; অথচ সাধারণ মানুষের জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে ‘ভুল ও সংশোধন’-এর যে চিরাচরিত প্রক্রিয়া অনিবার্য, তার জীবনে সেটির সামান্যতম চিহ্নও কেউ কখনো দেখতে পায়নি। ফলে তাদের কাছে এটি ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর যে, তাদেরই মাঝে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত (সাদিক ও আল-আমিন) হিসেবে সুপরিচিত একজন মানুষ

কীভাবে নিজে থেকে এমন গভীর জ্ঞান ও প্রাজ্ঞল বাণীর অধিকারী হতে পারেন! উপায়ান্তর না পেয়ে তারা তখন ধারণা করতে শুরু করে যে, নিশ্চয়ই কোনো শিক্ষিত অনারব ব্যক্তি তাকে এসব তথ্য শিখিয়ে দিচ্ছে। তাদের এই সংশয় ও অপবাদের জবাবে কুরআন নিজেই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছে:

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ  
بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا  
تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ  
كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ  
﴿١٧﴾

“(আপনি তাদের) বলুন, ‘আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে আমি তোমাদের কাছে এই কুরআন পাঠ করে শোনাতাম না এবং আল্লাহও তোমাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করতেন না। এটি সম্পূর্ণ তাঁরই সিদ্ধান্ত; কেননা এর আগে তো আমি তোমাদের মাঝে জীবনের দীর্ঘ এক সময় অতিবাহিত করেছি। (তখন কি তোমরা কখনো আমার মুখে এমন কথা শুনেছ?) তবুও

কি তোমরা সামান্যতম বুদ্ধিও প্রয়োগ করবে না?’ অতএব, তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে কিংবা তাঁর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে? বস্তুত, এমন অপরাধীরা কখনোই সফল হতে পারে না।” (কুরআন, ইউনুস, ১০:১৬-১৭)

অর্থাৎ হে নির্বোধের দল! তোমরা আমাকে কবে এসব বিষয়ে উৎসাহী দেখেছ? কিংবা এসব নিয়ে কোনো চিন্তাভাবনা ও মতামত ব্যক্ত করতে দেখেছ? অথবা এগুলোর সংকলন ও বিন্যাসের জন্য কোনো চর্চা ও সাধনায় নিমগ্ন হতে দেখেছ? কিংবা এ-সংক্রান্ত কোনো জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জন করতে দেখেছ, যেগুলো আজ কুরআনের সুরাগুলোতে একের পর এক আলোচিত হচ্ছে? দীর্ঘ চল্লিশ বছর আমি তোমাদের মাঝে অতিবাহিত করেছি। আমার কথাবার্তা কিংবা আচার-আচরণের মধ্যে তোমরা কবে এমন কিছু প্রত্যক্ষ করেছ, যাকে এই দাওয়াতের সূচনা বা পূর্বপ্রস্তুতি বলা যেতে পারে? আজ আমি যা উপস্থাপন করছি, তার ক্রমবিকাশ বা ধারাবাহিক

বিবর্তনের কোনো চিহ্ন কি তোমরা কখনো আমার অতীতে পেয়েছ? তোমরা তো ভালো করেই জানো যে, মানবেতিহাসে মানুষের মস্তিষ্ক তার বয়সের কোনো পর্যায়েই হঠাৎ এমন কিছু পেশ করতে পারে না, যার বিকাশ বা অগ্রগতির ছাপ তার পূর্ববর্তী ধাপগুলোতে বিদ্যমান থাকে না। তোমরা দাবি করছ যে, আমি আল্লাহর নামে মিথ্যা বলছি! এর আগে কোনো মিথ্যা, প্রতারণা, জালিয়াতি বা ধূর্ততার সামান্যতম ছোঁয়াও কি কখনো আমার চরিত্র ও স্বভাবে প্রত্যক্ষ করেছ? আজ অবধি তোমরা আমাকে ‘সাদিক’ (সত্যবাদী) ও ‘আমিন’ (বিশ্বস্ত) বলেই জেনে এসেছ; এখন কীভাবে বলছ যে, সেই সাদিক ও আমিন রাতারাতি এক আত্মপ্রবঞ্চক, চরম প্রতারক ও মিথ্যাবাদীতে পরিণত হয়েছে? হে আল্লাহর বান্দারা, তোমরা কেন সামান্যতম বুদ্ধিও প্রয়োগ করছ না?

দ্বিতীয়ত, মানুষের জ্ঞান কখনোই স্ববিরোধিতা থেকে মুক্ত হতে পারে না। ‘গড়লাম, পূজা করলাম, আবার ভেঙে ফেললাম’— চিন্তার সূচনা থেকে শেষ অবধি মানুষের পথচলায় মূলত

এই ভাঙা-গড়ার গল্পই অব্যাহত থাকে। গভীর বিচারে দেখা যায়, এটিও প্রকৃতপক্ষে সেই ‘ভুল ও সংশোধন’ প্রক্রিয়ারই ফল, যার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, মানুষের এই জ্ঞান যখন সাহিত্যের রূপ পরিগ্রহ করে, সেখানেও ফুটে ওঠে একই চিত্র। মানুষের সৃজনশীল কর্মগুলোকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে ছন্দ, অলংকার ও ভাববিন্যাসের মধ্যে বিস্তর তারতম্য চোখে পড়ে। তার কথা কোথাও হয়তো অলৌকিক সৌন্দর্যে ভাস্বর হয়ে ওঠে, আবার কোথাও হয়ে পড়ে অত্যন্ত সাধারণ, এমনকি অসংলগ্ন। সত্য কথা হলো, পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষের জন্ম হয়নি, যিনি ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বিষয়ে সাহিত্য-মান ও অলংকারে অলৌকিকতার স্তরে পৌঁছানো বক্তব্য অব্যাহতভাবে দিয়ে যাবেন এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সেই বক্তব্যগুলো যখন সংকলন করা হবে, তখন তা এমন সুসংগত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্যসমগ্রের রূপ নেবে, যেখানে চিন্তাধারার কোনো সংঘাত থাকবে না, বক্তার মানসিক অস্থিরতার কোনো ছাপ থাকবে না এবং মতামত

বা দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের কোনো চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এ ক্ষেত্রেও যদি কোনো ব্যতিক্রম থাকে, তবে তা কেবল কুরআনই। আর সে কারণেই বলা হয়েছে:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ  
اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.

“তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করে না? এটি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ থেকে হত, তবে তারা এতে অবশ্যই বহু অসংগতি ও বৈপরীত্য দেখতে পেত।” (কুরআন, সূরা নিসা, ৪:৮২)

উস্তাদ ইমাম আমিন আহসান ইসলাহি লিখেছেন:

“... কুরআনের প্রতিটি কথা এর মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখায় এতটাই সুসংহত ও সুবিন্যস্ত যে, গণিত কিংবা ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সূত্রগুলোও ততটা সুসংহত ও সুবিন্যস্ত নয়। কুরআন যেসব আকিদার শিক্ষা দেয়, সেগুলো একে অপরের সঙ্গে এমনভাবে গাঁথা যে, তার

মধ্য থেকে কোনো একটিকে আলাদা করলে পুরো শৃঙ্খলাই ভেঙে পড়বে। কুরআন যেসব ইবাদত ও আনুগত্যের নির্দেশ দেয়, তা আকিদা থেকে এমনভাবে উৎসারিত হয়, যেমনিভাবে কাণ্ড থেকে গজিয়ে ওঠে শাখা-প্রশাখা; আর কুরআন যেসব আমল ও নৈতিকতার তাগিদ দেয়, সেগুলো এর মূলনীতি থেকে এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করে, যেমনিভাবে কোনো বস্তু থেকে তার প্রাকৃতিক ও স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। কুরআনের সামগ্রিক শিক্ষা থেকে জীবনব্যবস্থার যে রূপ গড়ে ওঠে, তা একটি ‘বুনিয়ানুম মারসুস’ বা সিসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় মূর্ত হয়ে ওঠে; যার প্রতিটি ইট অপরটির সাথে এমনভাবে সংলগ্ন যে, পুরো ইমারতে কোনো শূন্যতা তৈরি না করে সেখান থেকে একটি ইটও বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়।” (তাদাব্বুরে কুরআন, ২/৭৪৩)

তৃতীয়ত, মানবজ্ঞান কখনোই পুরোপুরি সত্য বা ভ্রান্তিহীন হতে পারে না; তাতে সত্যের পাশাপাশি সর্বদা কিছু না কিছু মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটেই। ফলে মানুষ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে না নিতেই তার জ্ঞান, তথ্য, গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত,

যুক্তি ও অনুমানের ভুলগুলো স্পষ্ট হতে শুরু করে। সক্রোটস-প্লেটো বা নিউটন-আইনস্টাইন— সবার নিয়তি এটিই; এই নিয়তি থেকে কারো নিস্তার নেই। জ্ঞান ও সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাসে কোনো যুগে বা স্থানে এমন কোনো মানুষের দেখা মেলেনি, যিনি এর ব্যতিক্রম। কিন্তু কুরআন এই ক্ষেত্রেও বিস্ময়কর এক ব্যতিক্রম। আজ প্রায় দেড় হাজার বছর অতিবাহিত হতে চলেছে, কুরআন নিরন্তর পরীক্ষার সম্মুখীন; অথচ বড় বড় দার্শনিক, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কিংবা বিজ্ঞানীদের পক্ষেও কুরআনের কোনো কথাকে ভুল কিংবা এর কোনো শিক্ষাকে অসত্য প্রমাণ করা আজ অবধি সম্ভব হয়নি। গত তিন শতাব্দীতে পৃথিবী কোথা থেকে কোথায় পৌঁছেছে, অথচ এই দীর্ঘ পথচলায় এমন কোনো বাস্তবতা উন্মোচিত হয়নি, যা কুরআনের পেশ করা সত্যের পরিপন্থি। কোনো জ্ঞানই কুরআনে বর্ণিত জ্ঞানের অসারতা প্রমাণ করতে পারেনি। কুরআন মানুষকে কোনো নির্দেশনা দিয়েছে, তা যে উদ্দেশ্য সামনে রেখেই দিক না কেন, আজ পর্যন্ত এমন কোনো পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ সাধিত

হয়নি, যা কুরআনের দেওয়া সেই নির্দেশনাকে ভুল প্রমাণ করতে পারে। কুরআন যাকে ‘হক’ বলে, তা কখনো মিথ্যা হয়নি; আর যাকে ‘বাতিল’ বলে ঘোষণা করে, তা কখনো সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি। কুরআন সম্পর্কে এই সত্যগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত ও অনস্বীকার্য। এ বিষয়ে বলা হয়েছে:

وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ  
بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ  
﴿٤٢﴾

“প্রকৃত সত্য এই যে, এটি এক উঁচুমানের গ্রন্থ। এর সম্মুখ কিংবা পশ্চাৎ— কোনো দিক থেকেই মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। এটি অবতীর্ণ হয়েছে সেই সত্তার পক্ষ থেকে, যিনি পরম প্রজ্ঞাময় এবং যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী।” (কুরআন, হামিম সাজদা, ৪১:৪১-৪২)

এটিই সেই মানদণ্ড, যার ভিত্তিতে নিজের সত্যতা প্রমাণের পর কুরআন মানুষকে জানিয়েছে যে, তোমরা যে মহাবিশ্বকে ভুল করে নিজেদের স্রষ্টা ভেবে নিয়েছ, সেটিও তাঁরই সৃষ্টি,

যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি দেখছ না, এই জগতের প্রতিটি বস্তুই সৃষ্টির সৌন্দর্যের এক অলৌকিক বহিঃপ্রকাশ? প্রতিটি জিনিসের মাঝে নিহিত রয়েছে গভীর অর্থবহতা, অসাধারণ পরিকল্পনা, প্রজ্ঞা, সুনিপুণ ব্যবস্থাপনা, উপযোগিতা ও বিস্ময়কর নিয়মশৃঙ্খলা। এতে রয়েছে পরম সামঞ্জস্য ও গভীর সমন্বয়; রয়েছে অতুলনীয় জ্যামিতিক ও গাণিতিক অনুপাত, যার একমাত্র ব্যাখ্যা কেবল এটিই হতে পারে যে, মহাবিশ্বকেও সেই পরম প্রজ্ঞাবান ও মহাজ্ঞানী সত্তাই সৃষ্টি করেছেন, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের। তিনিই সেই সত্তা, যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য শয্যা এবং পর্বতমালাকে পেরেক বানিয়েছেন; তোমাদের সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়; তোমাদের নিদ্রাকে করেছেন শ্রান্তি দূরীকরণের উপায়, আর রাতকে করেছেন আবরণ ও দিনকে জীবিকা অনুসন্ধানের সময়; তোমাদের উর্ধ্বে নির্মাণ করেছেন সাতটি সুদৃঢ় আকাশ এবং সেখানে স্থাপন করেছেন এক প্রজ্বলিত প্রদীপ। তিনিই সেই সত্তা, যিনি ঘন মেঘমালা থেকে প্রচুর বারিপাত ঘটান; যেন তা

দিয়ে উৎপন্ন করতে পারেন শস্য, উদ্ভিদ ও ঘন  
সুশোভিত উদ্যান:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا  
هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ  
الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا  
يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ  
لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

“তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য  
নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাত। তিনি  
পরম করুণাময়, তাঁর মমতা চিরন্তন। তিনিই  
আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; তিনি  
সার্বভৌম অধিপতি, পরম পবিত্র সত্তা, শান্তি ও  
নিরাপত্তার আধার, রক্ষক, পরাক্রমশালী,  
প্রতাপশালী ও চরম শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তারা  
যাদের শরিক সাব্যস্ত করে, আল্লাহ তা থেকে  
সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনিই আল্লাহ: পরিকল্পনাকারী,  
অস্তিত্বদানকারী ও রূপকার; সকল সুন্দর নাম  
তাঁরই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু

তঁরই মহিমা ঘোষণা করে; আর তিনি পরম পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।” (কুরআন, সুরা হাশর, ৫৯:২২-২৪)

কুরআন জানিয়েছে, এই স্রষ্টার *রুবুবিয়াত* বা প্রভুত্বের স্বীকৃতি এমন এক মৌলিক বিষয়, যা সৃষ্টির শুরুতেই মানুষের সহজাত প্রকৃতি তথা *ফিতরাতে*র গভীরে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এর প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল এক আদি অঙ্গীকার ও চুক্তির মাধ্যমে। এই অঙ্গীকারের কথা কুরআন একটি বাস্তব ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করে। মানুষকে দুনিয়াতে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে বলে এই ঘটনাটি তার স্মৃতি থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু এর হাকিকত বা আসল বাস্তবতা তার অন্তরের গভীরে অঙ্কিত ও মস্তিষ্কের গহিনে সুগভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে; কোনো কিছুই একে মুছে ফেলতে পারে না। ফলে পরিবেশগত কোনো বাধা যদি না থাকে এবং মানুষকে এটি মনে করিয়ে দেওয়া হয়, তবে সে এর দিকে ঠিক সেভাবেই ধাবিত হয়, যেভাবে একটি অবোধ শিশু তার মায়ের দিকে ছুটে যায়, অথচ ঐ শিশু

কখনো মাতৃগর্ভ থেকে নিজেকে ভূমিষ্ঠ হতে দেখেনি। এতটাই দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সে তখন ধাবিত হয়, যেন সে পূর্ব থেকেই স্রষ্টাকে চেনে। সে উপলব্ধি করে: স্রষ্টার এই স্বীকৃতি তার ভেতরের একটি স্বভাবজাত চাহিদার পরম উত্তর, যা তার অন্তরেই বিদ্যমান ছিল। যখন সে তা পেয়ে যায়, তখন তার মনস্তত্ত্বের সকল দাবি পূরণ হয়। কুরআনের বক্তব্য হলো, মানুষের অন্তরের এই সাক্ষ্য এতটাই অকাট্য যে, আল্লাহর রুবুবিয়া/ত বা প্রভুত্বের বিষয়ে প্রতিটি মানুষ স্রেফ এই সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে বাধ্য। কুরআনে বলা হয়েছে:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ  
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى  
شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا  
غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ  
قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ  
الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ الْأَيَّاتِ  
وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾

“তাদেরকে সেই সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিন, যখন আপনার প্রতিপালক বনি আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং তাদেরকে নিজেদের ওপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: ‘আমি কি তোমাদের রব নই?’ তারা বলেছিল: ‘হ্যাঁ, (আপনিই আমাদের রব), আমরা সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি।’ তা এ কারণেই করা হয়েছে, যেন কিয়ামতের দিন তোমরা বলতে না পারো যে, ‘আমরা তো এ বিষয়ে একেবারেই অনবহিত ছিলাম।’ কিংবা এই অজুহাত পেশ করতে না পারো যে, ‘আমাদের পূর্বপুরুষেরাই তো পূর্বে শিরক বা অংশীস্থাপনের সূচনা করেছিল, আর আমরা ছিলাম তাদের পরবর্তী বংশধর মাত্র। তবে কি আপনি সেই পথভ্রষ্টদের কৃতকর্মের জন্য আমাদের ধ্বংস করবেন?’ আর এভাবেই আমি আমার আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি, যাতে মানুষের ওপর দলিল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারা যেন ফিরে আসে।” (কুরআন, সুরা আরাফ, ৭:১৭২-১৭৪)

এই স্বীকৃতিই মহাবিশ্বের প্রাণ। মানুষের বুদ্ধি এতে প্রশান্তি লাভ করে এবং তার হৃদয় পরিণত হয় নুরের উদয়স্থলে। ফলে সে উচ্চকণ্ঠে বলে

ওঠে : নিঃসন্দেহে আল্লাহই সেই সত্তা, যার নুরে  
এই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী আলোকিত :

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ  
فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ  
كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ  
زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا  
يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي  
اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

“আল্লাহ আসমান ও জমিনের জ্যোতি।  
(মানুষের অন্তরে) তাঁর এই জ্যোতির উপমা  
যেন একটি তাকের মতো, যার ভেতরে রয়েছে :  
একটি প্রদীপ। প্রদীপটি রক্ষিত কাচের এক  
আবরণের ভেতরে; সেই কাচটি দেখতে এক  
উজ্জ্বল দীপ্তিময় নক্ষত্রের ন্যায়। সেই প্রদীপটি  
প্রজ্বলিত করা হয় বরকতময় জলপাই বৃক্ষের  
তেল দিয়ে, যা না পূবের, আর না পশ্চিমের।  
তার তেল (এতটাই বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ যে), মনে  
হয় আগুন স্পর্শ করার আগেই তা নিজেই জ্বলে  
উঠবে। জ্যোতির ওপর জ্যোতি! আল্লাহ যাকে

ইচ্ছা তাঁর এই জ্যোতির দিকে পথপ্রদর্শন করেন। আল্লাহ মানুষের (উপলব্ধির) জন্য এসব উপমা পেশ করেন এবং আল্লাহ প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত।” (কুরআন, সুরা নূর, ২৪:৩৫)

উস্তাদ ইমাম লিখেছেন:

“... এই আকাশ ও পৃথিবী, বরং সমগ্র মহাবিশ্ব সেই ব্যক্তির জন্য এক অন্ধকার জগৎ ও আঁধারপুরি, যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, কিংবা বিশ্বাস করলেও আল্লাহর গুণাবলি ও সেগুলোর দাবিকে স্বীকার করে না। এমন ব্যক্তি না এটি জানতে পারে যে, পৃথিবী কোথা থেকে এসেছে; আর না এটি বুঝতে পারে যে, এর অস্তিত্বের পেছনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী। সে নিজের সম্পর্কেও এই ফয়সালা করতে পারে না যে, তার নিজের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কী? সে কি এই দুনিয়ায় সম্পূর্ণ বাঁধনহারা ও স্বেচ্ছাচারী, নাকি কোনো বিধানের অনুগত ও আজ্ঞাবহ? সে কি জবাবদিহির উর্ধ্বে, নাকি বাধ্য ও অনুগত? তার জন্য কোনটি কল্যাণ আর কোনটি অকল্যাণ? তাকে কি জুলুমের পথ অবলম্বন করতে হবে, নাকি ন্যায়ে? সে কি স্রেফ নিজের স্বার্থ ও কামনা-বাসনার অনুসরণ

করবে, নাকি সেগুলোর চেয়ে কোনো উচ্চতর পরম লক্ষ্যের পেছনে ছুটবে? এই প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তরের ওপর নির্ভর করে সঠিক ও সফল জীবনের ভিত্তি। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, সে এই প্রশ্নগুলোর সঠিক সমাধান খুঁজে পায় না। সে অন্ধকারের মাঝে অন্ধের মতো হাতড়ে বেড়ায় এবং শেষমেশ ধ্বংসের অতল গহবরে পতিত হয়ে নিজের অশুভ কর্মফল ভোগ করে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে তাঁর সঠিক গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের সাথে বিশ্বাস করে, সে এই মহাবিশ্বের আদি উৎসও খুঁজে পায় এবং এর চূড়ান্ত পরিণামও তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সেসব প্রশ্নের উত্তর, যার সমাধান অবিশ্বাসী মানুষ কখনো খুঁজে পায় না। এ কারণে এই পৃথিবী তার জন্য কোনো আঁধারপুরি হয়ে থাকে না; বরং ঈমানের নুরে তার জন্য প্রতিটি বস্তু ঝলমল করে ওঠে এবং জগতের প্রতিটি দিক তার কাছে আলোকিত হয়। যদিকে সে পা বাড়ায়, দিনের আলোয় পা বাড়ায়; আর যদিকেই সে অগ্রসর হয়, আল্লাহর ঈমানের নুর তাকে পথপ্রদর্শন করে। এই বাস্তবতাই উক্ত আয়াতে ফুটিয়ে

তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে, আসমান-জমিনের  
নুর হলেন: আল্লাহ। যার নিকট এই নুর রয়েছে,  
তিনি আলোতে আছেন এবং রয়েছেন সিরাতুল  
মুস্তাকিম তথা সোজা পথের ওপর। আর যে  
ব্যক্তি এই নুর থেকে বঞ্চিত, সে অন্ধকার  
জগতে দিশেহারা হয়ে ঘুরছে, তাকে অন্য কেউ  
আলো দিতে পারে না:

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ

(আল্লাহ যাকে নুর দান করেননি, তার জন্য  
কোনো নুরই নেই)।”

(তাদাব্বুরে কুরআন, ৫/৪০৯)



# মূলনীতি

ধর্মকে আমরা যেভাবে উপলব্ধি করেছি, তাতে তিনটি বিষয় মূলনীতি হিসেবে গণ্য:

প্রথমত, কুরআন হলো সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড (মিজান) ও পার্থক্যকারী (ফুরকান) এবং ওহির সমস্ত ধারার রক্ষক ও পর্যবেক্ষক। কুরআন অবতীর্ণই হয়েছে ধর্ম ও শরিয়তের বিষয়ে মানুষের মধ্যকার যাবতীয় মতভেদের মীমাংসা করার উদ্দেশ্যে, যাতে তারা প্রকৃত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কুরআন তার এই মর্যাদা নিজেই বর্ণনা করেছে। অতএব এর ওপর ভিত্তি করে কুরআন সম্পর্কে মূলনীতি হিসেবে যেসব বিষয় মান্য করা আবশ্যিক, তা হলো:

১. কুরআনের মূলপাঠ তথা টেক্সট পুরোপুরি সুনির্ধারিত। কুরআন কেবল তাই, যা ‘মুসহাফে’ লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং পশ্চিমের

কিছু এলাকা বাদে পুরো দুনিয়াতে মুসলিম উম্মাহর সিংহভাগ মানুষ বর্তমানে যেটির তিলাওয়াত করছে। এই তিলাওয়াত যে কিরাআত অনুযায়ী করা হয়, তাকে ‘কিরাআতে আম্মা’ বলা হয়। এটি ছাড়া অন্য কোনো কিরাআত কুরআন নয় এবং কুরআন হিসেবে সেটাকে উপস্থাপনও করা যাবে না।

২. কুরআন নিজের অর্থ প্রকাশে অকাট্য (কাতিউদ দালালা)। এর অর্থ হচ্ছে: মানুষ কুরআনের শব্দাবলির দিকনির্দেশনা গ্রহণ করলে কুরআনের শব্দাবলি তাকে অকাট্যভাবে ঠিক সেই অর্থ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা রাখে, যার জন্য শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষ মাঝেমাঝে কুরআনের মর্ম বুঝতে ব্যর্থ হয়, তা স্রেফ তার নিজের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও গবেষণার ঘাটতির ফল; কুরআনের ভাষা কিংবা বর্ণনামূল্যের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কুরআন নিজের উদ্দেশ্য প্রকাশে কখনোই অক্ষম নয়।

৩. কুরআনের এমন সকল আয়াতই মুহকাম, যেগুলোর ওপর কুরআনের হেদায়েত নির্ভরশীল। ‘মুতাশাবিহাত’ (রূপক) হচ্ছে কেবল ওইসব আয়াত, যেগুলোতে পরকালের কোনো নেয়ামত বা শাস্তিকে দৃষ্টান্ত বা উপমার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে, অথবা খোদাতায়ালায় গুণাবলি ও কার্যাবলি কিংবা আমাদের জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণের বাইরে থাকা জগৎ সম্পর্কে কোনো কথা উপমার আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়েছে। এই আয়াতগুলো অনির্ধারিত নয় এবং এগুলোর মর্মার্থের মধ্যেও কোনো অস্পষ্টতা নেই। এসব আয়াতের শব্দাবলিও ‘আরবি মুবিন’ তথা সুস্পষ্ট আরবি ভাষারই শব্দ এবং এগুলোর অর্থও আমরা বিনা দ্বিধায় বুঝতে পারি। তবে এগুলোর প্রকৃত বাস্তবতা আমরা পৃথিবীতে জানতে পারি না। এই জানা বা না জানার সাথে যেহেতু কুরআন বোঝার সম্পর্ক নেই, তাই আমরা এগুলোর প্রকৃত বাস্তবতার পেছনেও পড়ি না।

৪. কুরআনের বাইরে অন্য যেকোনো ওহি, তা প্রচ্ছন্ন কিংবা প্রত্যক্ষ যাই হোক না কেন, কুরআনের কোনো বিধানে সামান্যতম পরিবর্তন আনার ক্ষমতা রাখে না। এমনকি যে মহান নবীর ওপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তিনিও এর কোনো ছকুম বা নির্দেশ পরিবর্তন করতে পারেন না। ধর্মের মধ্যে যেকোনো বিষয়ের গ্রহণ বা বর্জনের সিদ্ধান্ত কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতের আলোকে হতে হবে। ঈমান ও আকিদার প্রতিটি আলোচনার সূচনা এখান থেকেই হয় এবং এখানেই তার সমাপ্তি ঘটে। যেকোনো ধরনের ওহি, ইলহাম, মনের গহিনের প্রচ্ছন্ন প্রেরণা, গবেষণা কিংবা মতবাদ— সবই এই কুরআনের অনুগত। ইমাম আবু হানিফা ও শাফেয়ি, বুখারি ও মুসলিম, আশআরি ও মাতুরিদি এবং জুনায়েদ ও শিবলি— সকল প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বের ওপর কুরআনের নিরঙ্কুশ শাসন প্রতিষ্ঠিত; তাদের মত বা গবেষণার কোনো

বিষয় যদি কুরআনের পরিপন্থি হয়, তবে তা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, সুন্নাত হলো ইব্রাহিমি ধর্মের সেই ঐতিহ্য, যাকে আল্লাহর রাসূল (সালামু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংস্কার ও পরিমার্জনের পর এবং কিছু সংযোজনসহ নিজের অনুসারীদের মাঝে ধর্ম হিসেবে জারি করেছেন। কুরআনে আল্লাহর রাসূলকে ‘মিল্লাতে ইব্রাহিমি’-র অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; এই ঐতিহ্যও মূলত তারই অংশ। প্রামাণিকতার দিক থেকে সুন্নাত ও কুরআন মাজিদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কুরআন মাজিদ যেভাবে সাহাবিদের ইজমা (সম্মিলিত বর্ণনা) ও এবং ‘মৌখিক ও লিখিত তাওয়াতুর’-এর মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, সুন্নাতও ঠিক সেভাবে সাহাবিদের ইজমা ও ‘ব্যবহারিক তাওয়াতুর’ (কর্মগত নিরবচ্ছিন্ন ধারা)-এর মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত এসেছে। কুরআনের মতোই সুন্নাত প্রতিটি যুগে সমগ্র মুসলিম উম্মতের ইজমা দ্বারা সুপ্রমাণিত। সুতরাং এ নিয়ে কোনো বিতর্ক বা দ্বিমতের অবকাশ নেই।

তৃতীয়ত, ধর্ম শুধু তা-ই, যা কুরআন ও সুন্নাতে বর্ণিত হয়েছে। এর বাইরে অন্যকিছুই ধর্ম নয় এবং ধর্ম হিসেবে সেটাকে গণ্যও করা যাবে না। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী, কর্ম এবং মৌনসম্মতির বিবরণ সংবলিত ‘আখবারে আহাদ’ তথা একক সূত্রের বর্ণনা দ্বারা ধর্মের মূল আকিদা বা আমলে নতুন কোনো বিষয়ের সংযোজন ঘটে না। ‘আখবারে আহাদ’ তথা একক সূত্রের বর্ণনাকে সাধারণত হাদিস বলা হয়। ধর্মসংক্রান্ত যে বিষয়গুলো হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো মূলত কুরআন ও সুন্নাতে বর্ণিত সেই মূল ধর্মেরই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং ধর্মের পালনের ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উত্তম আদর্শের রূপরেখা মাত্র। হাদিসের পরিধি কেবল এতটুকুই। ধর্মের সাথে সম্পর্কিত এই পরিধির বাইরের কোনো বিষয় হাদিস হতে পারে না এবং শুধু হাদিসের ভিত্তিতে সেটাকে গ্রহণও করা যাবে না। তবে এই পরিধির ভেতরে হাদিসের প্রামাণিকতা এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, যিনি এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে

নিশ্চিত হয়ে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী, কর্ম বা মৌনসম্মতি হিসেবে সেটাকে গ্রহণ করে নেন। তখন তা থেকে বিচ্যুত হওয়া সেই ব্যক্তির জন্য আর বৈধ থাকে না। বরং যদি তাতে আল্লাহর রাসুলের কোনো আদেশ বা সিদ্ধান্ত থাকে, তবে সেটার সামনে মাথা নত করা ওই ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

---



## সত্য ধর্ম

ধর্মের প্রকৃত বাস্তবতা যদি এক কথায় প্রকাশ করা হয়, তবে কুরআনের পরিভাষায় তা হলো আল্লাহর ‘ইবাদত’। জগতের প্রতিপালক এই দুনিয়ায় তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে মূলত এটাই চান। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

“আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি, যেন তারা আমার ইবাদত করে।” (সুরা জারিয়াত, ৫১:৫৬)

কুরআন মাজিদ বিভিন্ন স্থানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর নবীদের মানুষকে এই সত্য জানিয়ে দেওয়ার জন্যই প্রেরণ করেছেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ  
وَأَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.

“আমি প্রত্যেক জাতির মাঝে এক জন রাসূল পাঠিয়েছি এই বার্তা দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে দূরে থাকো।”  
(সূরা নাহল, ১৬:৩৬)

এই ‘ইবাদত’ শব্দের প্রকৃত অর্থ কী? গভীরভাবে লক্ষ্য করলে সূরা নাহলের এই আয়াত থেকেই তা স্পষ্ট। এখানে ‘আল্লাহর ইবাদত’ করার নির্দেশের বিপরীতে ‘তাগুত থেকে দূরে থাকার’ আদেশ এসেছে। কুরআনে ‘তাগুত’ ও ‘শয়তান’ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ যে আল্লাহর সামনে বিদ্রোহ, অহংকার ও উদ্ধত আচরণ করে। এর বিপরীত অর্থ হলো বিনয় ও নম্রতা। ইবাদত সম্পর্কে আরবি ভাষার বিশেষজ্ঞগণ বলেন, أصل العبودية الخضوع والتذلل (ইবাদতের মূল হলো বিনয় ও নম্রতা) [৯]।

---

৯ লিসানুল আরব, ৯/১০।

যখন আল্লাহর দয়া, ক্ষমতা, প্রতিপালন এবং প্রজ্ঞার সঠিক উপলব্ধি থেকে এই বিনয় ও নম্রতা জন্ম নেয়, তখন তা চূড়ান্ত ভালোবাসা ও চূড়ান্ত ভয়ের সঙ্গে আল্লাহর সামনে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণে রূপ নেয়। কুরআনে خُشوع (খুশু), خُضوع (খুদু), إِخْبَات (ইখবাত), إِنَابَة (ইনাবা), خَشْيَة (খাশিয়াত), تَضَرُّع (তাদাররু), قُنُوت (কুনুত) ইত্যাদি শব্দগুলো এই একই বাস্তবতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

এটি মূলত মানুষের অন্তরের গভীরে উদ্ভূত একটি অনুভূতি, যা তার অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এই অনুভূতির অভ্যন্তরীণ প্রকাশ হলো: ذِكْر (জিকর): আল্লাহর স্মরণ, شُكْر (শুকর): আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা, تَقْوَى (তাকওয়া): আল্লাহভীতি, إِخْلَاص (ইখলাস): আন্তরিকতা, تَوَكَّل (তাওয়াক্কুল): আল্লাহর ওপর নির্ভরতা, تَفْوِيض (তাফবিজ): আল্লাহর কাছে সবকিছু ন্যস্ত করা, رِضَا و تَسْلِيم (তাসলিম ও রিজা): আল্লাহর হুকুমের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টি।

এর অর্থ হলো, বান্দা তার প্রতিপালকের স্মরণে শান্তি খুঁজে পায়, তাঁর অনুগ্রহের প্রতি

কৃতজ্ঞতার জোয়ার অনুভব করে, তাঁর অসম্ভবত্বকে ভয় করে, একান্তভাবে তাঁরই হয়ে যায়, শুধু তাঁর ভরসায় জীবন কাটায়, নিজের সমস্ত কিছু তাঁর কাছে ন্যস্ত করে, নিজের অস্তিত্বকে তাঁর কাছে সমর্পণ করে এবং তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকে।

এই সম্পর্কের বাহ্যিক প্রকাশ সম্পর্কে কুরআন বলেছে:

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا  
سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا  
يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ  
الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا  
رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾

“(হে নবী), আমার আয়াতসমূহের প্রতি তো তারাই ঈমান আনে, যাদেরকে এসব আয়াতের মাধ্যমে স্মরণ করানো হলে তারা সিজদায় অবনত হয়, তারা তাদের প্রভুর প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তারা কখনো অহংকার করে না। তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে আলাদা থাকে (তারা রাতে জাগ্রত

থাকে), তারা ভয় ও আশা নিয়ে তাদের প্রভুকে ডাকতে থাকে এবং আমি তাদের যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।” (কুরআন, সূরা সাজদা, ৩২:১৫-১৬)

এই রুকু-সিজদাহ, তাসবিহ-তাহমিদ, দোয়া-মোনাজাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জান-মাল উৎসর্গ করাই প্রকৃত ইবাদত। তবে মানুষ যেহেতু দুনিয়ায় তার একটি বাস্তব জীবন ধারণ করে, তাই এই ইবাদত তার বাস্তব জীবনেও প্রতিফলিত হওয়া দরকার। ফলে ইবাদত শুধু উপাসনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আনুগত্যকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

এরপর এটি মানুষের কাছে দাবি করে যে, যার সামনে তার অন্তর নত হয়েছে, বাহ্যিকভাবেও তার সামনে নত হওয়া উচিত; যার কাছে সে নিজেকে অভ্যন্তরীণভাবে সমর্পণ করেছে, বাইরের জগতেও তার বিধান মেনে চলা উচিত; এমনকি তার জীবনের কোনো ক্ষেত্রই যেন এর বাইরে না থাকে। অন্যকথায়, সবদিক থেকে সে যেন তার প্রভুর বান্দা হয়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

“হে ঈমানদারগণ, রুকু করো, সিজদা করো, তোমাদের প্রভুর বন্দেগি করো এবং ভালো কাজ করো, যেন তোমরা সফল হতে পারো।”  
(কুরআন, সুরা হজ্জ, ২২:৭৭)

আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার এই সম্পর্কের জন্য ইবাদত যখন অতিপ্রাকৃতিক ও নৈতিক ভিত্তি নির্ধারণ করে, আচার-অনুষ্ঠান প্রবর্তন করে এবং দুনিয়ায় এই সম্পর্কের প্রয়োগের জন্য নিয়মকানুন নির্ধারণ করে, তখন কুরআন একে ‘দ্বীন’ (ধর্ম) বলে অভিহিত করে। আল্লাহতায়ালা বলেন:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ.

“তিনি তোমাদের জন্য ঐ ধর্মই নির্ধারণ করেছেন, যার নির্দেশনা তিনি নুহকে দিয়েছিলেন এবং যা আমি আপনার কাছেও ওহি করেছি, এছাড়া যার নির্দেশনা আমি

ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসাকেও দিয়েছিলাম এই বলে যে, তোমরা (নিজেদের জীবনে) এই ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখো<sup>১০</sup> এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি করো না।” (কুরআন, সুরা শুরা, ৪২:১৩)

এই ইবাদতের জন্য যে অতিপ্রাকৃতিক ও নৈতিক ভিত্তিসমূহ আল্লাহর এই ধর্মে নির্ধারিত হয়েছে, কুরআন একে ‘আল-হিকমাহ’ বলে এবং এর আচার-অনুষ্ঠান ও নিয়মকানুনকে ‘আল-কিতাব’ (আইন) বলে অভিহিত করে। আল্লাহতায়ালা বলেন:

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا.

“আল্লাহ আপনার প্রতি তাঁর আইন ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং এভাবে আপনাকে এমনসব বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহর কৃপা বিশাল।” (কুরআন, সুরা নিসা, ৪:১১৩)

---

<sup>১০</sup> অর্থাৎ যেকোনো অবস্থায় এর ওপর অবিচল থাকো। ‘ইকামতে দীন’-এর সঠিক অর্থ এটিই। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আমাদের ‘বুরহান’ বইয়ের প্রবন্ধ: ‘ব্যাখ্যার ভ্রান্তি’।

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ  
مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

“তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো,  
এবং সেই আইন ও প্রজ্ঞার কথা স্মরণ করো,  
যা তিনি তোমাদের উপর অবতীর্ণ করেছেন,  
যার মাধ্যমে তিনি তোমাদের উপদেশ দেন।  
আর আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো,  
নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে অবগত।”  
(কুরআন, সূরা বাকারা, ২:২৩১)

এই ‘কিতাব’কে কুরআন ‘শরিয়ত’ বলেও  
উল্লেখ করেছে:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا  
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

“অতঃপর, (হে নবী), আমি আপনাকে আমার  
ধর্মের একটি সুস্পষ্ট শরিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত  
করেছি, সুতরাং আপনি সেটার অনুসরণ করুন  
এবং তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করবেন না,  
যাদের কোনো জ্ঞান নেই।” (কুরআন, সূরা  
জাসিয়া, ৪৫:১৮)

‘হিকমাহ’ চিরকাল এক ও অভিন্ন থেকেছে, কিন্তু ‘শরিয়ত’ মানুষের সভ্যতার বিবর্তন ও পরিবর্তনের ফলে ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ  
اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً.

“তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি পৃথক শরিয়ত ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছি। যদি আল্লাহ চাইতেন, তাহলে তোমাদের সবাইকে এক সম্প্রদায় বানিয়ে দিতেন।” (কুরআন, সুরা মায়দা, ৫:৪৮)

আসমানি গ্রন্থসমূহের অধ্যয়ন করলে বোঝা যায়, তাওরাতে শরিয়তের আলোচনা বেশি হয়েছে, আর ইনজিলে হিকমাহ ও প্রজ্ঞার আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। জাবুর এই হিকমাহর ভূমিকা হিসেবে আল্লাহর স্তুতিসংগীত, আর কুরআন এসবের সমন্বিত এক মহৎ সাহিত্য এবং সুসংবাদ ও সতর্কবার্তার গ্রন্থ হিসেবে নাজিল হয়েছে:

وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ  
وَالْإِنْجِيلَ.

“(হে ঈসা), স্মরণ করো, যখন আমি তোমাকে  
আইন ও প্রজ্ঞা অর্থাৎ তওরাত ও ইনজিলের  
জ্ঞান দিয়েছিলাম।” (কুরআন, সুরা মায়েদা,  
৫:১১০)

‘হিকমাহ’ শব্দটি মূলত দুটি বিষয়ের জন্য  
ব্যবহৃত হয়েছে:

১. ঈমান ও বিশ্বাস সম্পর্কিত বিষয়সমূহ
২. নৈতিকতা ও চরিত্র সংক্রান্ত বিষয়সমূহ

আর ‘কিতাব’-এর অধীনে নিম্নলিখিত  
বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত: ১. ইবাদতের বিধান, ২.  
পারিবারিক ও সামাজিক বিধান, ৩. রাজনৈতিক  
বিধান, ৪. অর্থনৈতিক বিধান, ৫. দাওয়াতের  
বিধান, ৬. জিহাদের বিধান, ৭. দণ্ডবিধি ও শাস্তি,  
৮. খাদ্য ও পানীয়ের বিধান, ৯. সামাজিক  
রীতিনীতি ও শিষ্টাচার, ১০. শপথ ও শপথের  
কাফফারা সম্পর্কিত বিধান।

এটাই পূর্ণাঙ্গ ধর্ম।

আল্লাহর যেসব পয়গম্বর এই ধর্ম নিয়ে এসেছেন, তাদের ‘নবী’ বলা হয়। কুরআন থেকে বোঝা যায়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ ‘রিসালাত’-এর দায়িত্বও পেয়েছেন।

‘নবুয়ত’ হলো, কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি পেয়ে মানবজাতিকে সত্যের বার্তা পৌঁছে দেবেন, যারা তাঁকে মানবে, তাদেরকে কিয়ামত দিবসে শুভ পরিণতির সুসংবাদ দেবেন এবং অমান্যকারীদের অশুভ পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করবেন। কুরআন এটাকে ‘বাশারাত’ ও ‘ইনজার’ বলে অভিহিত করেছে:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ  
مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ.

“মানুষ ছিল এক সম্প্রদায়, পরে (তাদের মাঝে মতানৈক্য দেখা দিলে) আল্লাহ নবীদের পাঠালেন, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে।” (কুরআন, সূরা বাকারা, ২:২১৩)

আর ‘রিসালাত’ হলো এমন এক বিশেষ অবস্থান, যেখানে একজন নবী তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর বিচার বাস্তবায়ন করেন—যদি

তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে দুনিয়াতেই আল্লাহর শাস্তি তাদের ওপর প্রয়োগ করে তাদের বিরুদ্ধে সত্যকে বিজয়ী করেন:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ  
بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

“প্রত্যেক জাতির জন্য একজন রাসুল রয়েছে। অতঃপর যখন তাদের রাসুল আসেন, তখন ইনসাফ অনুযায়ী তাদের ফয়সালা করা হয় এবং তাদের প্রতি কোনো অবিচার করা হয় না।” (কুরআন, সূরা ইউনুস, ১০:৪৭)

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي  
الْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ  
اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾

“(তোমাদের জানা উচিত যে), যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সঙ্গে শত্রুতা করবে, তারাই সবচেয়ে বেশি অপমানিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, আল্লাহ লিখে রেখেছেন: ‘আমি ও আমার রাসুলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব।’ প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ শক্তিশালী ও

পরাক্রমশালী।” (কুরআন, সুরা মুজাদালা, ৫৮:২০-২১)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ  
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

“তিনিই সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসুলকে হিদায়াত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন, যাতে (এই ভূখণ্ডের) সকল ধর্মের উপর তিনি এটিকে বিজয়ী করেন, মুশরিকরা তা যতই অপছন্দ করুক।” (কুরআন, সুরা সফ, ৬১:৯)

এটি এভাবে ঘটে যে, আল্লাহতায়ালা তাঁর রাসুলদের নিজের ন্যায়বিচার প্রকাশের জন্য মনোনীত করেন এবং কিয়ামতের পূর্বে তাঁদের মাধ্যমে এই পৃথিবীতেই একটি ক্ষুদ্র কিয়ামত (ছোট মহাবিপর্ষয়) ঘটান। তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হয় যে, যদি তাঁরা আল্লাহর সাথে করা অঙ্গীকারে অবিচল থাকেন, তবে তার পুরস্কার এই দুনিয়াতেই পাবেন, আর যদি তা থেকে বিচ্যুত হন, তবে তার শাস্তিও এই দুনিয়াতেই তারা পেয়ে যাবেন। ফলস্বরূপ, তাঁদের অস্তিত্ব মানুষের জন্য আল্লাহর একটি নিদর্শন হয়ে ওঠে,

এবং মানুষ যেন তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহকে পৃথিবীতে বিচরণ ও বিচারকার্য পরিচালনা করতে দেখে।

এর পাশাপাশি, তাঁদের এই নির্দেশ দেওয়া হয় যে, নিজেদের চোখে দেখা সত্যের নিদর্শনাদির ভিত্তিতে সত্যের প্রচার করুন এবং আল্লাহতায়ালা হেদায়েত নিখুঁতভাবে ও পূর্ণ স্পষ্টতার সাথে মানুষের কাছে পৌঁছে দিন। কুরআনের ভাষায় একে বলা হয় ‘শাহাদাত’ (সাক্ষ্য প্রদান)। যখন এটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তা দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তি হয়। ফলে, আল্লাহতায়ালা রাসুলদের বিজয় দান করেন এবং তাঁদের আহ্বান প্রত্যাখ্যানকারীদের ওপর তাঁর শাস্তি আপতিত করেন। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ (স.)-কে কুরআন মাজিদে ‘শাহিদ’ (সাক্ষ্যদাতা) ও ‘শহীদ’ (প্রত্যক্ষ সাক্ষী) বলা হয়েছে। আল্লাহতায়ালা বলেন:

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا  
أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا.

“নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতি একজন রাসুল পাঠিয়েছি, তোমাদের ওপর সাক্ষীস্বরূপ, যেমন আমি ফিরাউনের কাছে একজন রাসুল পাঠিয়েছিলাম।” (কুরআন, সুরা মুয্যাম্মিল, ৭৩:১৫)

সাক্ষ্যদানের এই মর্যাদা কেবল রাসুলদের জন্যই নির্দিষ্ট নয়, বরং এটি সাইয়িদুনা ইবরাহিম (আ.)-এর বংশধরদেরও প্রদান করা হয়েছে। কুরআন মাজিদ একারণেই তাঁদেরকে আল্লাহর রাসুল ও তাঁর বান্দাদের মাঝে এক মধ্যবর্তী সম্প্রদায় — ‘উম্মাতান ওয়াসাতা’ — বলে ঘোষণা করেছে এবং জানিয়ে দিয়েছে যে, এই মর্যাদার জন্য তাদেরকে নির্বাচিত করা হয়েছে, যেমনভাবে আল্লাহতায়ালা আদম সন্তানদের মধ্য থেকে কিছু মহান ব্যক্তিত্বকে নবুয়ত ও রিসালাতের জন্য মনোনীত করেন। আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেছেন:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي

هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.

“(উপরন্তু তোমাদের পদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য) আল্লাহর পথে সংগ্রাম করো, যেমনভাবে সংগ্রাম করা উচিত। তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন এবং (যে শরিয়ত তোমাদের দান করেছেন, সেই) শরিয়তে তোমাদের জন্য কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি। তিনি তোমাদের পিতা ইবরাহিমের মিল্লাত তোমাদের জন্য পছন্দ করেছেন। তিনিই তোমাদের নাম ‘মুসলিম’ রেখেছেন, আগে এবং এই কুরআনেও (তোমাদের নাম ‘মুসলিম’)। তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন, যেন রাসুল তোমাদের কাছে (এই ধর্মের) সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং দুনিয়ার সকল মানুষের কাছে তোমরা (এই ধর্মের) সাক্ষ্যদাতা হও।” (কুরআন, সূরা হজ্জ, ২২:৭৮)

আল্লাহতায়ালা সাধারণত নবী ও রাসুলদের সাথে তাঁর কিতাবও নাজিল করেছেন। কুরআন মাজিদে এর উদ্দেশ্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, এগুলো সত্য ও মিথ্যার মধ্যে মানদণ্ড হয়ে

থাকবে, যাতে মানুষের পারস্পরিক মতভেদের মীমাংসা হয় এবং তারা সঠিকভাবে ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহতায়াল্লা এরশাদ করেছেন :

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ  
فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ.

“এবং তিনি তাদের সঙ্গে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তরূপে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যাতে মানুষের পারস্পরিক মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে এটি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করে।” (কুরআন, সূরা বাকারা, ২:২১৩)

وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ  
بِالْقِسْطِ.

“এবং তিনি তাদের সঙ্গে তাঁর কিতাব, অর্থাৎ ন্যায়ের মানদণ্ড অবতীর্ণ করেছেন, যাতে লোকেরা (সত্য ও মিথ্যার বিষয়ে) সঠিকভাবে ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।” (কুরআন, সূরা হাদিদ, ৫৭:২৫)

নবুয়ত ও রিসালাতের এই ধারাবাহিকতা আদম (আ.) থেকে শুরু হয়ে মুহাম্মাদুর

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে। তাঁর দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর ওহি ও ইলহামের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে এবং নবুয়ত সমাপ্ত করা হয়েছে। সুতরাং, মানুষকে ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সতর্কীকরণের দায়িত্ব কিয়ামত পর্যন্ত এই উম্মতের আলেমগণ পালন করবেন। সূরা তওবায় আলেমদের এই দায়িত্ব এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن  
كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ  
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ  
يَحْذَرُونَ.

“এটা সম্ভব নয় যে, সব মুসলিম একসাথে বের হয়ে যাবে, তবে এমন কেন হয়নি যে, তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু মানুষ বের হত, যেন তারা ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করে এবং তাদের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে (তাদের এইসব আচরণ সম্পর্কে) সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের কাছে ফিরে যাবে, যেন তারা

আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচতে পারে। (সুরা তাওবা, ৯:১২২)

এই সতর্কীকরণের জন্য আল্লাহতায়ালার নির্দেশনা হলো, তা কুরআনের মাধ্যমে করা হবে। (فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ) (এই কুরআনের মাধ্যমে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিন, যারা আমার হুঁশিয়ারিকে ভয় করে) [সুরা ক্বাফ ৫০ : ৪৫] এবং جَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (এই কুরআনের মাধ্যমে তাদের সাথে একটি বড় সংগ্রাম চালিয়ে যান) [সুরা ফুরকান ২৫ : ৫২]— এসব আয়াতে কুরআন এই নির্দেশ দিয়েছে। রাসুলুল্লাহ (স.) এই দৃষ্টিকোণ থেকে পুরো পৃথিবীবাসীর জন্য সতর্ককারী, এবং আলেমরা প্রকৃতপক্ষে তাঁর এই সতর্কবার্তাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেন: تَبَرَّكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا (অত্যন্ত মহিমান্বিত ও কল্যাণময় সেই সত্তা, যিনি তাঁর বান্দার উপর এই ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন যেন তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারেন)। [সুরা ফুরকান, ২৫:১]।

আল্লাহতায়ালার ইরশাদ করেছেন:

وَأَوْحِي إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ.

“এই কুরআন আমার কাছে ওহি করা হয়েছে যেন এর মাধ্যমে আমি তোমাদের সতর্ক করি এবং যাদের কাছে এটি পৌঁছাবে তাদেরকেও।”  
(সুরা আনয়াম ৬ : ১৯)

এই ধর্মের নাম ‘ইসলাম’ এবং এটি সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা তাঁর কিতাবে বলেছেন যে, তিনি আদম সন্তানদের থেকে এর বাইরে অন্য কোনো ধর্ম কখনও গ্রহণ করবেন না :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ... وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ  
الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ  
الْخَاسِرِينَ.

“কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর কাছে ধর্ম একমাত্র ইসলাম ... বস্তুত যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম সন্ধান করবে, সেটি তার কাছ থেকে কখনোই গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।”  
(সুরা আলে ইমরান ৩ : ১৯, ৮৫)

‘ইসলাম’ শব্দটি যেমন পুরো ধর্মের জন্য ব্যবহৃত হয়, তেমনি ধর্মের প্রকাশ্য দিককে কখনও কখনও এই ‘ইসলাম’ শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করা হয়। প্রকাশ্য দিক বিবেচনায় ‘ইসলাম’ পাঁচটি বিষয়কে বলা হয় :

১. এই কথা স্বীকার করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (স.) তাঁর রাসুল

২. নামাজ প্রতিষ্ঠিত রাখা

৩. জাকাত প্রদান করা

৪. রমজানের রোজা রাখা

৫. বাইতুল্লাহর হজ্জ করা।

কুরআন মাজিদে বিভিন্ন স্থানে এই বিষয়গুলোর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (স.) এর একটি হাদিসে এগুলো একত্রে এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً  
رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم  
رمضان، وتحج البيت.

“ইসলাম হচ্ছে: তুমি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ  
ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (স.)  
তঁর রাসুল, নামাজ প্রতিষ্ঠিত রাখবে, জাকাত  
প্রদান করবে, রমজানের রোজা রাখবে, এবং  
বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে।” (সহিহ মুসলিম,  
হাদিস নং : ৯৩)

ধর্মের ভিতরগত দিক হলো ‘ঈমান’।  
কুরআনে এর যে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে, তার  
আলোকে ‘ঈমান’ও পাঁচটি বিষয়কে বলা হয়:

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান
  ২. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান
  ৩. নবীগণের প্রতি ঈমান
  ৪. আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান
  ৫. পরকালের প্রতি ঈমান
- সুরা বাকারাতে বলা হয়েছে:

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ  
وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ  
وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا  
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

“রাসুল নিজে তাঁর কাছে তাঁর প্রভুর তরফ থেকে যা কিছু নাজিল করা হয়েছে, তা বিশ্বাস করেছেন এবং বিশ্বাসীগণও তা বিশ্বাস করেছে। তারা সবাই আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস করেছে। (তাদের উক্তি হচ্ছে): আমরা আল্লাহর রাসুলগণের মধ্যে কারো মাঝেই পার্থক্য করি না। তারা আরো বলেছে যে, আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য স্বীকার করলাম; ওগো আমাদের প্রভু, আমরা আপনার ক্ষমা চাই, আপনার কাছেই তো আমাদের ফিরে যেতে হবে।” (সুরা বাকারা ২ : ২৮৫)

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের একটি শাখা হিসেবে তাকদিরের ভালো-মন্দকে এতে অন্তর্ভুক্ত করে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

الإيمان أن تؤمن بالله، وملئكته وكتبه،  
ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره  
وشره.

“ঈমান হলো এই যে, তুমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর  
ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের  
প্রতি, তাঁর রাসুলদের প্রতি, পরকালের প্রতি  
এবং তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তাকদিরের  
ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।”  
(সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ৯৩)

এই ঈমান যখন তার প্রকৃত স্বরূপ অনুযায়ী  
অন্তরে প্রবেশ করে এবং অন্তর থেকে নিজের  
স্বীকৃতি আদায় করে, তখন তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে  
দুটি বিষয়ের দাবি জানায় :

এক. সৎকর্ম,

দুই. পরস্পরকে সত্য এবং সত্যের উপর  
অবিচল থাকার উপদেশ।

আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেছেন :

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا  
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ  
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

“সময় সাক্ষ্য দেয়, নিশ্চয় এই মানুষেরা ক্ষতির  
মধ্যে পড়তে যাচ্ছে। তবে তারা নয়, যারা ঈমান  
এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং একে অপরকে  
সত্যের উপদেশ দিয়েছে আর একে অপরকে  
সত্যের ওপর অবিচল থাকারও উপদেশ  
দিয়েছে।” (সূরা আসর ১০৩ : ১-৩)

সৎকর্ম বলতে সেইসকল কাজ বোঝায়, যা  
নৈতিক পরিশুদ্ধির ফলস্বরূপ উদ্ভূত হয়। এর  
সমস্ত ভিত্তি বুদ্ধি ও মানবীয় সহজাত প্রবৃত্তির  
উপর সুপ্রতিষ্ঠিত এবং আল্লাহর শরিয়ত  
মানবজাতিকে এই সৎকর্মের দিকে পথনির্দেশনা  
দানের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

‘তাওয়্যাসি বিল হক’ ও ‘তাওয়্যাসি বিস  
সবর’-এর অর্থ হলো— নিজের সমাজে একে  
অপরকে সত্য ও সত্যের ওপর অবিচল থাকার  
উপদেশ দেওয়া। এটি সত্য গ্রহণের স্বাভাবিক  
দাবি, যাকে কুরআনে ‘আমর বিল মারুফ’ ও

‘নাহি আনিল মুনকার’ অর্থাৎ ‘ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা’ বলেও ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, যে বিষয়গুলো বুদ্ধি ও স্বভাবগতভাবে উত্তম হিসেবে স্বীকৃত, সেগুলোর জন্য মানুষকে উপদেশ দেওয়া এবং যেগুলো মন্দ, সেগুলো থেকে মানুষকে বিরত রাখা।

আল্লাহতায়াল্লা বলেন:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ  
بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

“মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের সহযোগী। তারা সৎকর্মের আদেশ করে এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখে।” (সূরা তওবা ৯ : ৭১)

একইভাবে এটাও জরুরি যে, দুনিয়ায় যদি কোনো স্থানে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্জিত হয়, তবে নিজেদের মধ্য থেকে কিছু লোককে এই কাজের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে নিযুক্ত করা হবে। বলা হয়েছে:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ  
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

“এবং এটাও উচিত যে, তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোক নিযুক্ত থাকবে: যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে, সৎকাজের উপদেশ দেবে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে। (তোমরা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করো) এবং (মনে রেখো) যারা এই কাজ করবে, তারাই সফল হবে।” (কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:১০৪)

স্পষ্টতই, এই দায়িত্ব কিছু ক্ষেত্রে প্রচার ও উপদেশের মাধ্যমে এবং কিছু ক্ষেত্রে আইনের শক্তির মাধ্যমে পালন করা হবে।<sup>[১১]</sup> প্রথম রূপটির

---

<sup>১১</sup> এর মাধ্যমে মূলত সেসব বিধানকে বোঝানো হয়েছে, যা পালন করার নির্দেশ মুসলমান সমাজের সামষ্টিক সত্তাকে দেওয়া হয়েছে। এর বিপরীতে যেসব নির্দেশ ব্যক্তি হিসেবে মানুষকে দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তি কোনো সরকার বা আইনের কাছে দায়বদ্ধ নয়; বরং কেবল তার নিজ প্রতিপালকের সামনেই জবাবদিহি করতে বাধ্য। এ ধরনের ক্ষেত্রে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও উপদেশ-পরামর্শের গণ্ডির বাইরে সরকারের কোনো আইনগত অধিকার বা প্রশাসনিক কর্তৃত্ব নেই, যতক্ষণ না কারো অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়া

জন্য রয়েছে জুমার মিস্কার, যা এই উদ্দেশ্যেই শাসক ও নীতি-নির্ধারকদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে; আর দ্বিতীয় রূপটির জন্য রয়েছে পুলিশ বিভাগ, যা মুসলিমদের রাষ্ট্রে এই দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়।

প্রতিটি মুসলমানের উচিত ঈমানের এই দাবি নির্ধা ও কল্যাণকামিতার চেতনা নিয়ে পূরণ করা। এই চেতনা ছাড়া ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্যের সাথে এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন:

الدين النصيحة، لله، ولكتابه، ولرسوله،  
ولأئمة المسلمين وعامتهم.

“ধর্ম হচ্ছে কল্যাণকামিতা— আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসুলের জন্য, মুসলমানদের শাসকদের জন্য এবং সাধারণ জনগণের জন্য।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৯৬)

---

কিংবা জান, মাল ও সম্ভ্রমের ওপর কোনো আঘাত আসার আশঙ্কা তৈরি হয়।

সাধারণ অবস্থায় ঈমানের দাবি এগুলোই, তবে বাস্তব জীবনে মানুষের বহিরাগত পরিস্থিতির কারণে অতিরিক্ত আরও তিনটি দাবি উদ্ভূত হতে পারে:

এক. হিজরত (দেশ ত্যাগ),

দুই. নুসরত (সহায়তা),

তিন. কিয়াম বিল কিন্তু (ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা)।

যদি কোনো মুমিন এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, যেখানে তার জন্য আল্লাহর উপাসনায় স্থির থাকা জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে, ধর্মের কারণে তাকে নিপীড়নের শিকার হতে হয়, এমনকি তার পক্ষে নিজের ইসলাম প্রকাশ করাও সম্ভব না হয়, তাহলে তার ঈমান তাকে এটাই শেখায় যে, সে ঐ জায়গা ত্যাগ করে এমন কোনো স্থানে চলে যাবে, যেখানে সে স্বাধীনভাবে আল্লাহর ধর্ম মেনে চলতে পারবে। কুরআন একে ‘হিজরত’ বলে। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সরাসরি হিজরতের আহ্বান জানান, তখন

যারা তাতে সাড়া দেয়নি, কুরআন তাদের জন্য জাহান্নামের কঠিন শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ  
قَالُوا فِيَمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي  
الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً  
فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ  
مَصِيرًا.

“(হে নবী, এখনো যেসকল মুসলমান কাফিরদের এলাকা ছেড়ে হিজরত করে আসেনি, আপনি তাদের জানিয়ে দিন), ফেরেশতারা যাদের প্রাণ এমন অবস্থায় হরণ করবেন যে, (নিজেদের ঈমানকে শঙ্কায় ফেলে) তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করছিল, ফেরেশতারা তাদের জিজ্ঞেস করবেন, এ কোন অবস্থায় তোমরা ছিলে? তারা উত্তর দিবে, আমরা এ দেশে একেবারেই অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলবেন, আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করে যেতে

পারতে? এদের ঠিকানাই তো জাহান্নাম। কত মন্দ ঠিকানা এটি!” (সুরা নিসা ৪ : ৯৭)

একইভাবে, যদি ধর্মের প্রচার বা রক্ষার জন্য কোনো পদক্ষেপের প্রয়োজন হয়, তাহলে ঈমানের দাবি হলো জান-মাল দিয়ে ধর্মের সাহায্য করা। কুরআনের ভাষায়, এটি বিশ্বজাহানের প্রভু আল্লাহর ‘নুসরত’। যখন রাসুলুল্লাহ (স.) মদিনায় রাষ্ট্র-ক্ষমতা লাভের পর এ প্রয়োজন অনুভব করেন এবং লোকদেরকে জিহাদ ও কিতালের আহ্বান জানানো হয়, তখন কুরআন এক স্থানে এ বিষয়ে এভাবে মানুষকে আহ্বান জানায়:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ

الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا تَصْرُ مِّنَ اللَّهِ  
وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ يَا أَيُّهَا  
الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى  
ابْنُ مَرْيَمَ لِحَوَارِيِّينَ مَن أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ  
الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ.

“হে ঈমানদারগণ, আমি কি তোমাদেরকে  
এমন এক বাণিজ্যের কথা বলব, যা  
তোমাদেরকে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে  
মুক্তি দিবে? [ইহুদিদের আচরণের বিপরীতে],  
তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি  
যথার্থভাবে ঈমান আনবে এবং নিজেদের  
সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম  
করবে। এটি তোমাদের জন্য উত্তম, যদি  
তোমরা বুঝতে পারো।  
এর প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা  
করবেন, তোমাদেরকে এমনসব বাগানে প্রবেশ  
করাবেন, যেগুলোর নিচ দিয়ে নদীনালা  
প্রবাহিত হবে এবং অনন্তকালের উদ্যানসমূহে  
উৎকৃষ্ট বাসস্থান দিবেন। এটাই হলো  
মহাসাফল্য। এছাড়া আরেকটি বস্তুও দিবেন,  
যা তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো: আল্লাহর পক্ষ

থেকে সাহায্য এবং অত্যাশন্ন বিজয়। [হে নবী], এই সুসংবাদটি ঈমানদারদের জানিয়ে দিন। হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও, যেমন মরিয়ম-পুত্র ঈসা হাওয়ারিদের বলেছিলেন: “আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী কে হবে?” হাওয়ারিগণ উত্তর দিল: “আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী।” (সুরা সফ ৬১ : ১০-১৪)

ধর্মের সংরক্ষণ, পুনঃস্থাপন ও পুনর্জীবনের যত কাজই এ যাবৎ হয়েছে, তা ঈমানের এই দাবি পূর্ণ করার জন্যই হয়েছে। উম্মাহর ইতিহাসে ভাষা ও কলম, তীর-তলোয়ার এবং অর্থকড়ি দিয়ে ধর্মের জন্য যত প্রচেষ্টা হয়েছে, তার মূল উৎস হচ্ছে এই ‘নুসরত’। কুরআনের দাবি হলো, যদি কখনো ঈমানের এই দাবি সামনে আসে, তাহলে একজন মুমিনের জন্য পৃথিবীর কোনো কিছুই এর চেয়ে বেশি প্রিয় হওয়া উচিত নয়। যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দাওয়াতে এই মুহূর্তটি আসে, তখন কুরআন বলেছে:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ  
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا  
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا  
أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ  
فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي  
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.

“তাদেরকে বলুন: যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, মন্দা পড়ার ঝুঁকিতে থাকা ব্যবসা এবং তোমাদের পছন্দের বাসগৃহ— এসব তোমাদের কাছে আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে বেশি প্রিয় হয়, তাহলে অপেক্ষা করো যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর ফয়সালা প্রকাশ করছেন। আর (স্মরণ রাখো), এমন অঙ্গীকার ভঙ্গকারী লোকদেরকে আল্লাহ পথ দেখাবেন না।” (সূরা তওবা ৯ : ২৪)

এরপর ধর্ম ও দুনিয়ার কোনো বিষয়ে যদি মানুষের চেতনা, সাম্প্রদায়িক টান, স্বার্থ এবং বাসনা তাকে ন্যায়ের পথ থেকে সরিয়ে দিতে

চায়, তবে ঈমানের দাবি শুধু এটা নয় যে, সে সত্য ও ন্যায়ের ওপর অবিচল থাকবে, বরং সাক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন হলে জানবাজি রেখে হলেও সাক্ষ্য দিবে। সত্য বলবে, সত্যের সামনে মাথা নত করবে। ন্যায়বিচার করবে, ন্যায়ের সাক্ষ্য দিবে এবং তার বিশ্বাস ও আচরণে কখনোই সত্য ও ন্যায়ের বাইরে কিছু গ্রহণ করবে না। এটিই হচ্ছে ‘কিয়াম বিল কিস্ত’ (ন্যায় প্রতিষ্ঠা) এবং কুরআন মাজিদে এর নির্দেশ এইভাবে এসেছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ  
شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ  
بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوتُوا أَوْ  
تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

“হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর জন্য ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী হয়ে ন্যায়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকো; যদিও তা নিজের বিপক্ষে যায় অথবা নিজের মাতাপিতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিপক্ষে যায়। ধনী হোক বা গরিব উভয়ের ওপরই আল্লাহর হক বেশি। (তাই উভয়ের ওপরই আল্লাহর

বিধান প্রযোজ্য হবে)। অতএব (আল্লাহর বিধান ছেড়ে) প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। তা করলে তোমরা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। আর (স্মরণ রাখো), যদি তোমরা (সত্য ও ন্যায়ের কথাকে) বিকৃত করার অথবা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করো, তাহলে এর শাস্তি অবশ্যই পাবে, কারণ তোমরা যা কিছু করছ, আল্লাহ তার খবর রাখেন।” (সুরা নিসা ৪ : ১৩৫)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ  
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۭ أَلَّا  
تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ.

“হে ঈমানদারগণ, (আল্লাহর সাথে কৃত এই অঙ্গীকারের আলোকে) তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী হয়ে দৃড়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকো। কিছু লোকের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচার থেকে সরে যেতে প্ররোচিত না করে। ন্যায়বিচার করো। এটি তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় করো। নিঃসন্দেহে তোমরা যা কিছু করছ,

আল্লাহ তার খবর রাখেন। (সুরা মায়িদা ৫ : ৮)

এই ধর্মের যে উদ্দেশ্য কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, তা কুরআনের পরিভাষায় ‘তাজকিয়া’। এর মানে হলো, মানুষের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনকে কলুষতা থেকে মুক্ত করে তার চিন্তা-ভাবনা ও কর্মকে সঠিক দিকে উন্নতি প্রদান করা। কুরআন মাজিদে বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে যে, মানুষের অভীষ্ট লক্ষ্য হলো পরম সুখের জ্ঞানাত এবং এমন এক রাজত্ব লাভ, যেখানে সে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে এবং আল্লাহও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। আর সফলতা ও কল্যাণের এই অবস্থানে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা সেই সব মানুষের জন্য, যারা এই পৃথিবীতে নিজেদের তাজকিয়া (নৈতিক পরিশুদ্ধি) সম্পন্ন করবে:

قد أفلح من تَزَكَّى ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ  
فَصَلَّى ﴿١٥﴾ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ  
الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿١٧﴾

“ঐ ব্যক্তি সফল, যে পরিশুদ্ধ হয়েছে এবং এ উদ্দেশ্যে তার প্রভুর নাম স্মরণ করেছে, অতঃপর নামাজ পড়েছে। (হে লোকসকল, কিয়ামত অস্বীকারের পক্ষে তোমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই), বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ, অথচ পরকাল তার চেয়ে উত্তম ও স্থায়ী।”

অতএব, ধর্মের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো তাজকিয়া (নৈতিক পরিশুদ্ধি অর্জন)। আল্লাহর রাসূল এ লক্ষ্যে প্রেরিত হয়েছেন এবং পুরো ধর্ম এই লক্ষ্য অর্জনে মানুষের পথপ্রদর্শন করতে নাজিল হয়েছে।

আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ.

তিনি নিরক্ষরদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূলের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং এর

জন্য তাদেরকে বিধান ও হিকমাহ শিক্ষা দেন।  
(সুরা জুমুআ ৬২ : ২)

এই ধর্ম পালনের জন্য এর অনুসারীদের যে পন্থা গ্রহণ করা উচিত, তা হলো ‘ইহসান’। ইহসানের মানে হলো কোনো কাজকে তার সেরা উপায়ে করা। ধর্মের মধ্যে যখন কোনো কাজ এইভাবে করা হয় যে, তার ভিতরগত দিক এবং বাহ্যিক রূপ, দুটো পুরো ভারসাম্যের সঙ্গে বিবেচনায় থাকে, তার প্রতিটি অংশ পরিপূর্ণভাবে মাথায় রাখা হয় এবং কাজ করার সময় ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত মনে করে, তখন তাকে ‘ইহসান’ বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا.

“ঐ ব্যক্তির চেয়ে কার ধর্ম উত্তম হতে পারে, যে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে, উত্তমভাবে কাজ সম্পন্ন করে এবং ইবরাহিমের পথ ও পন্থার অনুসরণ করে, যিনি ছিলেন পুরোটাই একনিষ্ঠ।” (সুরা নিসা ৪ : ১২৫)

নবী (স.) তাঁর প্রাঞ্জল ভাষায় এর ব্যাখ্যা  
এইভাবে করেছেন:

الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن  
تراه فإنه يراك.

“ইহসান হলো, তুমি আল্লাহর ইবাদত এইভাবে  
করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ; কারণ যদি তুমি  
তাঁকে না দেখো, তবে তিনি তো তোমাকে  
দেখছেন।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ৯৩)



## ইসলাম ও রাষ্ট্র

বর্তমানে কতিপয় চরমপন্থি সংগঠন তাদের অপতৎপরতার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য যে সংকটাপন্ন পরিস্থিতি তৈরি করেছে, তা মূলত সেই চিন্তাধারারই পরিণতি, যা আমাদের ধর্মীয় মাদরাসাগুলোতে অধ্যয়ন ও চর্চা করা হয় এবং বিভিন্ন ইসলামি আন্দোলন ও ধর্মীয় রাজনৈতিক দল দিন-রাত যার প্রচার-প্রসার চালিয়ে যাচ্ছে। এর বিপরীতে ইসলামের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি ও সঠিক চিন্তা কী— আমরা আমাদের ‘মিজান’ গ্রন্থে তা পর্যাপ্ত দলিল-প্রমাণসহ উপস্থাপন করেছি। এর বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমাদেরকে সেই মূল গ্রন্থ তথা ‘মিজান’-এর শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন; তথাপি এর যে অংশটি ইসলাম ও রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত, তার একটি সারসংক্ষেপ আমরা এখানে উপস্থাপন করছি:

১. ইসলামের দাওয়াত মূলত ব্যক্তি কেন্দ্রিক। ইসলাম মানুষের মন ও মানসে নিজের আদর্শিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ইসলাম সমাজকে যেসব বিধিবিধান দিয়েছে, সেগুলোও মূলত ওইসব ব্যক্তিদের সম্বোধন করে দিয়েছে, যারা মুসলিম সমাজে নীতিনির্ধারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অতএব এই ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন যে, রাষ্ট্রের নিজস্ব কোনো ধর্ম রয়েছে এবং কোনো অবজেক্টিভ রেজোলিউশন (Objective Resolution) বা সাংবিধানিক ‘উদ্দেশ্য প্রস্তাব’-এর মাধ্যমে রাষ্ট্রকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মুসলমান বানানোর কিংবা এই মর্মে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা আরোপ করার প্রয়োজন রয়েছে যে, সেখানে কুরআন ও সুন্নাতের পরিপন্থি কোনো আইন প্রণয়ন করা যাবে না। যারা এই ধারণা পেশ করেছেন এবং রাষ্ট্রকে তা গ্রহণ করানোতে সফল হয়েছেন, তারা বর্তমান যুগের জাতিরাষ্ট্রগুলোর (Nation States) অভ্যন্তরে স্থায়ী বিভাজনের গোড়াপত্তন করেছেন। তারা এসব রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের কাছে কার্যত এই বার্তাই

পৌঁছে দিয়েছেন যে, অমুসলিমরা মূলত দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক; যাদের বড়জোর একটি ‘সুরক্ষিত সংখ্যালঘু’ (protected minority) হিসেবে গণ্য হওয়ার সুযোগ রয়েছে এবং রাষ্ট্রের মূল মালিকদের কাছে তারা যদি কোনো অধিকার দাবি করতে চায়, তবে স্রেফ এই পরিচয়েই করতে পারে।

২. যেসব দেশে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, তারা চাইলে নিজেদের সংগঠিত করে একটি ‘ইউনাইটেড স্টেটস’ বা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে পারে। এটি আমাদের প্রত্যেকের স্বপ্ন হতে পারে এবং তা বাস্তবায়নে আমরা নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামও করতে পারি; কিন্তু এই ধারণার কোনো ভিত্তি নেই যে, এটি ইসলামি শরিয়তের কোনো নির্দেশ, যা লঙ্ঘন করলে মুসলমানরা গুনাহগার হবে। মোটেও তা নয়; ‘খিলাফত’ কোনো ধর্মীয় পরিভাষা নয় এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে তা প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের কোনো আদেশও নয়। হিজরি প্রথম শতাব্দীর পরপরই যখন মুসলিম উম্মাহর প্রথিতযশা ফকিহগণ বিদ্যমান ছিলেন,

তখনই মুসলমানদের দুটি পৃথক সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল— একটি বাগদাদে আব্বাসি খিলাফত এবং অন্যটি আন্দালুসে উমাইয়া খিলাফত, যা কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। কিন্তু তৎকালীন ফকিহদের কেউই এটাকে ইসলামি শরিয়তের লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য করেননি। কারণ, এ বিষয়ে কুরআন ও হাদিসে আদতে কোনো নির্দেশনা নেই। তবে এর বিপরীতে একটি বিষয়ে সবাই ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং আমরাও এটাই বলি: যদি কোনো স্থানে মুসলমানদের সামষ্টিক ব্যবস্থা (রাষ্ট্র) প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জঘন্যতম অপরাধ। এ বিষয়ে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সতর্ক করে বলেছেন, এই অপকর্মে লিপ্ত ব্যক্তি জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে।<sup>[১২]</sup>

৩. ইসলামে জাতীয়তার ভিত্তি ‘ইসলাম’ নয়, যেমনটি সাধারণত ধারণা করা হয়। কুরআন

---

<sup>১২</sup> বুখারি, রেওয়ায়েত নম্বর: ৭০৫৩-৭০৫৪।

ও হাদিসের কোথাও এটি বলা হয়নি যে, মুসলমানরা একটি নির্দিষ্ট জাতি অথবা তাদের একটি অভিন্ন জাতিতেই রূপ নিতে হবে; বরং বলা হয়েছে: **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ** (মুসলমানরা পরস্পরের ভাই ভাই<sup>১৩</sup>)।

কুরআনের দৃষ্টিতে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক জাতীয়তার নয়, বরং ভ্রাতৃত্বের। তারা দশ-বিশটি জাতি, দেশ ও রাষ্ট্রে বিভক্ত থাকা সত্ত্বেও ঈমানের বন্ধনে একে অপরের ভাই। তাই তাদের কাছে এই দাবি তো করা যেতেই পারে এবং করা উচিত যে, তারা যেন নিজেদের ভাইদের খবরাখবর রাখে, তাদের বিপদ ও কষ্টে এগিয়ে আসে, মজলুম হলে তাদের সহায়তা করে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার দেয় এবং তাদের জন্য নিজেদের দরজা কোনো অবস্থাতেই বন্ধ না করে; কিন্তু এই দাবি তোলা যাবে না যে, নিজেদের জাতিরাষ্ট্র ও জাতীয় পরিচয় বিসর্জন দিয়ে আবশ্যিকভাবেই এক জাতি

---

<sup>১৩</sup> কুরআন, সূরা হুজুরাত, ৪৯:১০।

ও একক রাষ্ট্রে পরিণত হতে হবে। মুসলমানরা যেভাবে নিজেদের পৃথক পৃথক জাতিরাষ্ট্র গঠন করতে পারে, ঠিক তেমনি ধর্ম ও শরিয়ত পালনের স্বাধীনতা থাকলে অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে নাগরিক হিসেবে এবং ভূখণ্ডের ভিত্তিতে এক জাতি হয়ে বসবাসও করতে পারে। কুরআন ও সুন্নাতের দৃষ্টিতে এর কোনোটিই অবৈধ নয়।

৪. দুনিয়াতে যেসব মানুষ মুসলমান হিসেবে পরিচিত, যারা নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে স্বীকার করে এবং দৃড়তার সাথে নিজেদের এই পরিচয়টাই প্রকাশ করে, কিন্তু এমন কোনো আকিদা বা আমল গ্রহণ করে, যা কোনো আলেম বা আলেমসমাজ অথবা সাধারণ মুসলমান সঠিক মনে করেন না, তবে তাদের সেই আকিদা বা আমলকে ভুল বলা যেতে পারে, এমনকি সেটাকে ভ্রান্তি বা গোমরাহিও বলা যেতে পারে; কিন্তু যেহেতু এর অনুসারীরা কুরআন ও হাদিস থেকেই নিজেদের সমর্থনে দলিল পেশ করে, তাই তাদেরকে অমুসলিম বা কাফের ঘোষণা করা যাবে না। এ ধরনের আকিদা ও

আমলের ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালা কী—  
তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষা করা  
উচিত। দুনিয়াতে এর অনুসারীরা নিজেদের  
স্বীকৃতি অনুযায়ী মুসলমান এবং তারা  
মুসলমান হিসেবেই গণ্য হবে। তাদের সাথে  
সমস্ত লেনদেন ও আচরণ সেভাবেই হবে,  
যেভাবে মুসলমান সমাজের একজন  
সদস্যের সাথে করা হয়। আলেমদের  
অধিকার রয়েছে তাদের ভুল তাদের সামনে  
স্পষ্ট করার, তাদেরকে সঠিক সত্য গ্রহণের  
উদাত্ত আহ্বান জানানোর; তাদের আকিদা-  
বিশ্বাসে কোনো কিছু শিরক হলে সেটাকে  
শিরক এবং কুফর হলে সেটাকে কুফর বলার  
এবং সাধারণ মানুষকেও সে বিষয়ে সতর্ক  
করার। কিন্তু তাদের ব্যাপারে এই চূড়ান্ত  
ফয়সালা দেওয়া যে, তারা আর মুসলমান  
নেই কিংবা তাদেরকে মুসলমান সমাজ  
থেকে বহিস্কার করা উচিত— এই অধিকার  
কারো নেই। কারণ, এই অধিকার একমাত্র  
আল্লাহই প্রদান করতে পারতেন; আর  
কুরআন ও হাদিস সম্পর্কে অবগত প্রতিটি

মানুষই জানেন যে, আল্লাহ এই অধিকার কাউকে প্রদান করেননি।

৫. শিরক, কুফর ও ধর্মত্যাগ অবশ্যই গুরুতর অপরাধ, কিন্তু এই অপরাধের শাস্তি একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে দিতে পারে না। এটি একমাত্র আল্লাহর অধিকার। পরকালেও এর শাস্তি তিনিই প্রদান করবেন এবং দুনিয়াতেও যদি কখনো চান, তবে তিনিই দেন। পরকালের হিসাবনিকাশের বিষয়টি এখন আলোচনার প্রসঙ্গ নয়। দুনিয়াতে এর রূপ এমন হয় যে, আল্লাহতায়াল্লা যখন কোনো জাতির ওপর তাঁর বিচারকার্য পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাদের কাছে নিজের রাসুল প্রেরণ করেন। সেই রাসুল উক্ত জাতির সামনে চূড়ান্তভাবে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার কাজ তথা ‘ইতমামে হুজ্জাত’ সম্পন্ন করেন, যাতে আল্লাহর দরবারে পেশ করার মতো কারো কাছে কোনো অজুহাত অবশিষ্ট না থাকে। অতঃপর আল্লাহর ফয়সালা নেমে আসে এবং যারা এভাবে সত্য সুস্পষ্ট হওয়ার পরও কুফর ও শিরকের ওপর অবিচল

থাকে, তাদেরকে এই দুনিয়াতেই বিনাশ বা শাস্তির মুখোমুখি করা হয়। এটি আল্লাহর একটি অপরিবর্তনীয় বিধান (সুন্নাতুল্লাহ), যা কুরআন এভাবে বর্ণনা করেছে: “প্রত্যেক জাতির জন্যই একজন রাসুল রয়েছে। অতঃপর যখন তাদের রাসুল উপস্থিত হন, তখন তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করা হয় এবং তাদের ওপর কোনো জুলুম করা হয় না।”<sup>[১৪]</sup> এটা হজরত ইসমাইল (আলাইহিস সালাম)-এর কুরবানি এবং খিজির (আলাইহিস সালাম)-এর ঘটনার মতো একটি বিষয়। সাধারণ মানুষের কর্মসীমার সাথে এর কোনো দূরতম সম্পর্কও নেই। আমরা যেভাবে কোনো দরিদ্র মানুষকে সাহায্য করার অজুহাতে তার অনুমতি ছাড়া তার নৌকায় ছিদ্র করতে পারি না, কোনো সন্তানকে বাবা-মায়ের অবাধ্য হতে দেখে তাকে হত্যা করতে পারি না, কিংবা নিজের কোনো স্বপ্নের ওপর ভিত্তি করে ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর মতো নিজের

---

<sup>১৪</sup> কুরআন, সূরা ইউনুস, ১০: ৪৭।

পুত্রের গলায় ছুরি চালাতে পারি না— ঠিক একইভাবে কোনো ব্যক্তিকে তার শিরক, কুফর বা ধর্মত্যাগের শাস্তিও দিতে পারি না; যতক্ষণ না প্রত্যক্ষ ওহি আসে এবং আল্লাহ তাঁর কোনো রাসুলের মাধ্যমে সরাসরি এর নির্দেশ প্রদান করেন। প্রতিটি মানুষই অবগত আছেন যে, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর ওহির সেই দরজা এখন চিরতরে বন্ধ।

৬. এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জিহাদ ইসলামের একটি বিধান। কুরআন তার অনুসারীদের কাছে এই দাবি করে যে, শক্তি ও সামর্থ্য থাকলে তারা যেন জুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে। কুরআনে এর নির্দেশনা মূলত ‘ফিতনা’ নির্মূলের উদ্দেশ্যেই প্রদান করা হয়েছে। ‘ফিতনা’ অর্থ: কোনো ব্যক্তিকে জুলুম ও জবরদস্তির মাধ্যমে স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা; ইংরেজিতে যাকে persecution বলা হয়। বিজ্ঞজন মাত্রই অবগত যে, মুসলমানদেরকে এই নির্দেশ ব্যক্তিগত পর্যায়ে দেওয়া হয়নি; বরং তা

দেওয়া হয়েছে জামাত বা সমষ্টিগতভাবে। কুরআনে এই বিষয়ে যত আয়াত এসেছে, সেগুলোতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোনো মুসলিমকে সম্বোধনই করা হয়নি। অতএব এ বিষয়ে যেকোনো পদক্ষেপ গ্রহণের এখতিয়ার কেবল তাদের সামষ্টিক ব্যবস্থা অর্থাৎ রাষ্ট্রেরই রয়েছে। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোনো অবস্থাতেই নিজ উদ্যোগে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার রাখে না। এ কারণেই আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “মুসলমানদের শাসক হলেন তাদের ঢালস্বরূপ, কেবল তার পেছনে থেকেই যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়।”<sup>[১৫]</sup>

৭. ইসলাম যে জিহাদের নির্দেশ দেয়, তা আল্লাহর পথে সংগ্রাম; তাই নৈতিকতার সীমা লঙ্ঘন করে তা পরিচালনার কোনো অবকাশ নেই। নৈতিকতা সর্বাবস্থায় সবকিছুর উর্ধ্বে। এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও আল্লাহতায়ালার নৈতিকতার সীমা অতিক্রম

---

<sup>১৫</sup> বুখারি, রেওয়ায়েত নম্বর: ২৯৫৭।

করার অনুমতি কাউকে প্রদান করেননি। অতএব এ কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও অকাট্য যে, জিহাদ কেবল সরাসরি যুদ্ধরতদের (combatants) বিরুদ্ধেই পরিচালিত হবে। ইসলামের বিধান হলো: কেউ যদি কথা দিয়ে আক্রমণ করে, তবে তার উত্তর কথা দিয়েই দেওয়া হবে; কেউ যদি যোদ্ধাদের আর্থিক সহায়তা জোগায়, তবে তাকে সেই অর্থ জোগান থেকে নিবৃত্ত করা হবে; কিন্তু যতক্ষণ না সে অস্ত্র হাতে সরাসরি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে, ততক্ষণ তার প্রাণহরণ করা যাবে না। এমনকি খোদ যুদ্ধক্ষেত্রেও যদি সে অস্ত্র সমর্পণ করে, তবে তাকে বন্দি করা যাবে, কিন্তু হত্যা করা যাবে না। কুরআনে জিহাদের নির্দেশ যে আয়াতে দেওয়া হয়েছে, তার শব্দগুলো এমন: “তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে; এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।”<sup>[১৬]</sup> আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

<sup>১৬</sup> কুরআন, সূরা বাকারা, ২: ১৯০।

সাল্লাম) যুদ্ধের ময়দানে নারী ও শিশুদের হত্যা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।<sup>[১৭]</sup> এর কারণ হলো: তারা যদি যোদ্ধাদের সাথে অভিযানে গেলেও সাধারণত তারা সরাসরি যোদ্ধা হয় না; বড়জোর তারা যোদ্ধাদের মনস্তাত্ত্বিক সাহস জোগাতে পারে কিংবা কথা দিয়ে উৎসাহের দিতে পারে।

৮. আধুনিক যুগের পশ্চিমা চিন্তাবিদদের কয়েক শতাব্দী পূর্বেই কুরআন ঘোষণা করেছে: **أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ** (মুসলমানদের সামষ্টিক ব্যবস্থা তাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হবে<sup>[১৮]</sup>)। এর স্পষ্ট অর্থ হলো: মুসলমানদের সরকার তাদের পরামর্শের ভিত্তিতেই গঠিত হবে। রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থা পরামর্শের মাধ্যমেই অস্তিত্ব লাভ করবে। পরামর্শ বা মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিটি নাগরিকের অধিকার

---

<sup>১৭</sup> বুখারি, রেওয়ায়েত নম্বর: ৩০১৫; মুসলিম, রেওয়ায়েত নম্বর: ১৭৪৪।

<sup>১৮</sup> কুরআন, সুরা শূরা, ৪২:৩৮।

সমান। পরামর্শের ভিত্তিতে যা গঠিত হবে, কেবল পরামর্শের মাধ্যমেই তা বিলুপ্ত করা যাবে। যে সামষ্টিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য পরামর্শ করা হবে, প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীন মতামত তার অস্তিত্বের ভিত্তি হবে। ঐকমত্যের মাধ্যমে ফয়সালা সম্ভব না হলে মতভেদ নিরসনে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে গ্রহণ করা হবে।

মূলত এটিই গণতন্ত্র। অতএব স্বৈরতন্ত্র— তা কোনো পরিবারের হোক কিংবা কোনো শ্রেণি, গোষ্ঠী বা জাতীয় প্রতিষ্ঠানের হোক— কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এমনকি সামষ্টিক ব্যবস্থা (রাষ্ট্র) সংক্রান্ত ধর্মীয় বিধানাবলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের কর্তৃত্ববাদ চলতে পারে না। তারা অবশ্যই নিজেদের ব্যাখ্যা ও মতামত প্রকাশের অধিকার রাখেন; কিন্তু তাদের সেই মতামত জনগণের জন্য পালনীয় আইন হিসেবে তখনই গণ্য হবে, যখন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তা অনুমোদন করবে। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায়

‘পার্লামেন্ট’ নামক প্রতিষ্ঠান এই উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছে। রাষ্ট্র পরিচালনায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার পার্লামেন্টের এবং এটাই হওয়া উচিত। পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তের গঠনমূলক সমালোচনা করার কিংবা ভুল ধরিয়ে দেওয়ার অধিকার নাগরিকদের অবশ্যই রয়েছে; কিন্তু আইন লঙ্ঘন করা কিংবা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহে লিপ্ত হওয়ার অধিকার কারো নেই। আলেমসমাজ কিংবা রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ— কারো অবস্থানই পার্লামেন্টের উর্ধ্বে হতে পারে না। ‘আমরুছম শুরা বাইনাছম’ নীতি প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এই বিষয়ে বাধ্য করে যে, পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তের সাথে নীতিগত দ্বিমত থাকলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তারা সেই সিদ্ধান্তের প্রতি অনুগত থাকবে। ইসলামে সরকার গঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনার এটিই একমাত্র বৈধ রূপরেখা। এর বাইরে যেভাবে যে সরকারই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, তা অবৈধ সরকার হিসেবে গণ্য হবে— চাই সেই সরকারপ্রধানের কপালে সেজদার দাগ

থাকুক কিংবা তাকে ‘আমিরুল মুমিনিন’ উপাধিতে ভূষিত করা হোক।

৯. কোনো অঞ্চলে মুসলমানদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে সাধারণত তার নিকট ‘শরিয়া আইন বাস্তবায়নের’ দাবি তোলা হয়। এই প্রকাশভঙ্গিটি বিভ্রান্তিকর। কারণ এতে এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে, ইসলাম সরকারকে শরিয়তের যাবতীয় বিধান রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্যে মানুষের ওপর বাস্তবায়ন করার অধিকার দিয়েছে। অথচ কুরআন ও হাদিসের কোথাও কোনো সরকারকে এই অধিকার দেওয়া হয়নি। ইসলামি শরিয়তে দুই ধরনের বিধান রয়েছে— এক, যেসব বিধান কোনো ব্যক্তিকে ‘ব্যক্তি’ হিসেবে দেওয়া হয়েছে; এবং দুই, যেসব বিধান দেওয়া হয়েছে মুসলমান সমাজের সামষ্টিক সত্তাকে। প্রথম প্রকারের বিধান সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার ব্যক্তিগত বিষয়; এখানে ব্যক্তি কোনো পার্থিব সরকারের কাছে দায়বদ্ধ নয়, বরং কেবল তার প্রতিপালকের কাছেই জবাবদিহি করতে বাধ্য। অতএব পৃথিবীর কোনো সরকার, উদাহরণস্বরূপ

কাউকে রোজা রাখা, হজ্জ ও ওমরা পালন করা, খতনা করা বা গোঁফ ছাঁটার বিষয়ে বাধ্য করতে পারে না; কিংবা নারী হলে তাকে বুক আবৃত রাখা, রূপসজ্জার প্রসাধনী প্রদর্শন না করা কিংবা স্কার্ফ পরিধান করে বাইরে বের হতে বাধ্য করতে পারে না। এ জাতীয় বিষয়ে শিক্ষা প্রদান ও উপদেশ-পরামর্শের বাইরে সরকারের কোনো আইনগত এখতিয়ার নেই; যদি না এতে অন্য কারো অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়া কিংবা জান, মাল ও সম্ভ্রমের ওপর কোনো ধরনের জুলুমের আশঙ্কা থাকে। কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছে যে, ধর্মের করণীয় বিধানগুলোর মধ্যে কেবল সালাত ও জাকাতই এমন দুটি বিষয়, যার দাবি মুসলমানদের সামষ্টিক ব্যবস্থা চাইলে আইনের শক্তিতে করতে পারে। কুরআনের নির্দেশনা হলো: এ দুটি সম্পন্ন করার পর তাদের পথ ছেড়ে দিতে হবে এবং অন্য কোনো বিধান তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া

যাবে না।<sup>[১৯]</sup> দ্বিতীয় প্রকারের বিধানগুলো দেওয়াই হয়েছে সরকারের উদ্দেশ্যে; কারণ সামষ্টিক বিষয়াবলিতে সরকারই পুরো সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে। আলেমসমাজ যদি সরকারকে এই বিধানগুলো পালনের আহ্বান জানান, তবে তারা অবশ্যই সঠিক পথে আছেন এবং নিজেদের বিশেষ পদের কারণে এটা তাঁদের করাও উচিত। তবে এটি মূলত ‘শরিয়া পালনের দাওয়াত’; ‘শরিয়া আইন বাস্তবায়ন’ শব্দবন্ধ এর জন্যও উপযুক্ত প্রকাশভঙ্গি হতে পারে না।

সামষ্টিক প্রকৃতির এই দ্বিতীয় প্রকারের বিধানগুলো নিম্নরূপ:

ক. মুসলমানরা তাদের শাসকদের প্রজা নয়, বরং সমান অধিকারসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে। আইন ও রাষ্ট্রীয় পরিসরে তাদের মাঝে উচ্চ-নিচ কিংবা অভিজাত ও সাধারণ শ্রেণিতে কোনো বৈষম্য করা যাবে না। তাদের জ্ঞান, মাল ও সম্ভ্রম পবিত্র বলে গণ্য

---

<sup>১৯</sup> কুরআন, সূরা তওবা, ৯:৫।

হবে। এমনকি সরকার তাদের সুস্পষ্ট সম্মতি ব্যতিরেকে জাকাত ছাড়া অন্যকোনো কর তাদের ওপর আরোপ করতে পারবে না। তাদের ব্যক্তিগত বিষয়াদি— অর্থাৎ বিবাহ, তালাক, মিরাস বণ্টন, লেনদেন এবং এ জাতীয় যেকোনো বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি হলে ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে। দৈনন্দিন নামাজ, রমজানের রোজা এবং হজ্জ ও ওমরা পালনের জন্য তাদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। তাদের ওপর ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে এবং ‘আমরুল্‌হুম শুরা বাইনাহুম’ নীতিতে শাসনকার্য পরিচালিত হবে। তাদের জাতীয় সম্পদসমূহ সামষ্টিক প্রয়োজনের জন্য সংরক্ষিত থাকবে; সেগুলো ব্যক্তিগত মালিকানায় সোপর্দ করা হবে না। বরং এমন প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় তার প্রবৃদ্ধি ঘটানো হবে, যেন অর্থনৈতিক দৌড়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীও এই সম্পদের আয় থেকে

নিজেদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে। তারা যখন ইহজগৎ থেকে বিদায় নেবে, তখন মুসলমানদের রীতি অনুযায়ী তাদের কাফন-দাফন সম্পন্ন হবে, জানাজা অনুষ্ঠিত হবে এবং মুসলমানদের কবরস্থানে নিয়ম মেনে দাফন করা হবে।

- খ. জুমার নামাজ ও দুই ঈদের নামাজের ব্যবস্থা রাষ্ট্র বা সরকার পরিচালনা করবে। এই নামাজগুলো কেবল সরকারের পক্ষ থেকে নির্ধারিত স্থানগুলোতেই অনুষ্ঠিত হবে। এসব নামাজের মিম্বর কেবল শাসকদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তারা নিজেরা এসব নামাজের খুতবা প্রদান করবেন ও ইমামতি করবেন, অথবা তাদের নির্ধারিত প্রতিনিধি এই দায়িত্ব পালন করবে। রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানার অভ্যন্তরে কোনো ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে এসব নামাজের আয়োজন করতে পারবে না।

গ. আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো মূলত ‘আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার’ (ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ)-এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করবে। ফলে সমাজের সর্বাপেক্ষা সৎ, খোদাভীরু ও যোগ্য ব্যক্তিবর্গকে এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য নির্বাচন করা হবে। তারা মানুষকে সৎকাজের উপদেশ প্রদান করবে এবং সেসব অপকর্ম থেকে বিরত রাখবে, যেগুলোকে মানুষ আবহমান কাল থেকে মন্দ মনে করে আসছে। তবে আইনের প্রশাসনিক শক্তি কেবল তখনই প্রয়োগ করা যাবে, যখন কোনো ব্যক্তি অন্যের অধিকার হরণ করবে কিংবা কারো জ্ঞান, মাল বা সম্ভ্রমের ওপর আঘাত হানার অপচেষ্টা চালাবে।

ঘ. সরকার শত্রুপক্ষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রেও সর্বদা ন্যায্যনিষ্ঠ থাকবে। সত্য উচ্চারণ করবে, সত্যের সাক্ষ্য দেবে এবং সত্য ও ন্যায্যবিচার থেকে বিচ্যুত

হয়ে কখনো কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না।

ঙ. রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বা আন্তর্জাতিক পরিসরে কারো সাথে যদি কোনো চুক্তি হয়, তবে চুক্তি যতক্ষণ বহাল আছে, শব্দ ও অর্থ— উভয় দিক থেকে পূর্ণ সততা ও আমানতদারির সাথে তা পালন করা হবে।

চ. মানুষ হত্যা ও ফাসাদ ফিল আরদ (দেশে বিশৃঙ্খলা) ব্যতীত অন্যকোনো অপরাধের জন্য কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না। এছাড়া রাষ্ট্রের কোনো মুসলমান নাগরিক যদি জিনা-ব্যভিচার, চুরি, মানবহত্যা, ফাসাদ ফিল আরদ (দেশে বিশৃঙ্খলা) এবং কাজফ (ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া)-এর মতো অপরাধে লিপ্ত হয় এবং আদালত নিশ্চিত হয় যে, অপরাধী তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার আলোকে কোনো শিথিলতা বা ছাড় পাওয়ার যোগ্য নয়, তবে তার ওপর সেইসব দণ্ড কার্যকর

করা হবে, যা আল্লাহতায়ালার তাঁর কিতাবে এই অপরাধগুলোর ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছেন। ইসলামের দাওয়াতকে পূর্ণ সচেতনতা ও চিন্তের প্রশান্তির সাথে কবুল করার পর যারা এই অপরাধগুলোতে লিপ্ত হবে, তাদের জন্যই মূলত এইসব দণ্ড নির্ধারিত।

- ছ. ইসলামের দাওয়াত বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তরে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বিশ্বের কোনো শক্তি যদি এতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে কিংবা ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর জুলুম-নিপীড়ন চালায়, তবে সরকার নিজ সামর্থ্য ও শক্তি অনুযায়ী সেই প্রতিবন্ধকতা অপসারণ এবং নিপীড়ন বন্ধের চেষ্টা চালাবে— এমনকি যদি এর জন্য অস্ত্র ধারণও করতে হয়।<sup>[২০]</sup>

---

২০ ইসলামের উৎসসমূহে এই বিধানগুলোর দলিলের জন্য দেখুন, আমাদের বই ‘মিজান’।

১০. সামষ্টিক ব্যবস্থা তথা রাষ্ট্রসংক্রান্ত শরিয়তের এই বিধানগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠোর সতর্কবাণী ও হুঁশিয়ারিসহ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর কিতাবের প্রতি ঈমান আনার পর এসব বিষয়ে আল্লাহর অবতীর্ণ আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে না, কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহর দরবারে জালিম, ফাসিক ও কাফির হিসেবে গণ্য হবে।<sup>[২১]</sup> এরপরও যদি মুসলমানদের নীতিনির্ধারকরা এ বিষয়ে অবহেলা করে কিংবা অবাধ্যতা প্রদর্শন করে, তবে আলেম ও সংস্কারকদের দায়িত্ব এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে এর পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করবেন। তারা প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক পথ অবলম্বনের আহ্বান জানাবেন, তাদের জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হবেন, তাদের সংশয় নিরসন করবেন এবং যৌক্তিক প্রমাণের ভিত্তিতে তাদের কাছে স্পষ্ট করবেন যে, আল্লাহতায়াল্লা কেন তাঁর

---

<sup>২১</sup> কুরআন, সূরা মায়েদা, ৫:৪৪-৪৭।

শরিয়ত অবতীর্ণ করেছেন? সামষ্টিক জীবনের সাথে তার সম্পর্ক কোথায়? সেখানে এসব বিধানের ভিত্তি কী এবং আধুনিক যুগের মানুষদের তা অনুধাবন করতে কেন অসুবিধা হচ্ছে? শরিয়তের ব্যাখ্যার জন্য তারা এমনসব প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করবেন, যাতে শরিয়তের হিকমত, যৌক্তিকতা এবং এর উদ্দেশ্যসমূহ তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তাদের মন ও মানস পূর্ণ তৃপ্তির সাথে সেটিকে গ্রহণ করতে ও পালন করতে প্রস্তুত হয়। কুরআনে আলেম ও সংস্কারকদের মূল দায়িত্বকে ‘দাওয়াত ও ইনজার’ (আহ্বান ও সতর্কীকরণ) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। তারা তাদের জাতির সাধারণ মানুষ নীতিনির্ধারকদের ওপর ‘দারোগা’ (নিয়ন্ত্রক) হিসেবে নিযুক্ত হননি যে, নিজেদের অনুসারীদের দিয়ে দল গঠন করে বন্দুকের জোরে তাদেরকে শরিয়া মান্যকারী বানানোর চেষ্টা করবেন।

## নাহি আনিল মুনকার

ঈমানের এক অপরিহার্য দাবি হলো: মানুষকে ভালো কাজের উপদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজে মানা করা। এই উপদেশ দান ও মানা করা— দুটোই প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের নীতিতে এবং দাওয়াত ও নসিহতের স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতে হওয়া আবশ্যিক। মানুষের হেদায়েত ও গোমরাহির বিষয়টি আল্লাহতায়ালা সম্পূর্ণ নিজের হাতে রেখেছেন। তিনি তাদেরকেও চেনেন, যারা তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত এবং তাদেরকেও চেনেন, যারা হেদায়েত পাওয়ার যোগ্য। অতএব সত্য ও ন্যায়ের দাওয়াত পেশ করতে গিয়ে কোনো ব্যক্তির ‘দারোগা’ বা নিয়ন্ত্রক হওয়া উচিত নয় এবং নিজের সম্বোধিত মানুষদের জন্য জালাত বা জাহান্নামের সিদ্ধান্ত দেওয়াও উচিত নয়। এ বিষয়ে কুরআন একেবারে স্পষ্ট যে, সত্যের আহ্বানকারী হিসেবে আল্লাহর কোনো নবীকেও তাজকির

(স্মরণ করানো), নসিহত এবং ‘বালাগে মুবিন’ (সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া) ছাড়া অন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালার ঘোষণা:

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ  
بِمُصِيطِرٍ ﴿٢٢﴾

“আপনি তো কেবল উপদেশদাতা, তাদের ওপর কোনো দারোগা নন।” (কুরআন, সুরা গাশিয়া, ৮৮: ২১-২২)

তবে এখতিয়ার বা কর্তৃত্বের পরিধির বিষয়টি ভিন্ন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর একজন পুরুষ কোনো নারীর স্বামী এবং তার পরিণতিতে সন্তানদের পিতা হয়ে ওঠেন। মানুষের এই উভয় পরিচয় ধর্ম ও ফিতরাতে দৃষ্টিতে তাদের জন্য একটি এখতিয়ারভুক্ত ক্ষেত্র তৈরি করে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকারগুলোর ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। এগুলো যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এগুলোর কর্তৃধারদের জন্যও স্বকীয় এখতিয়ারের একটি পরিধি গড়ে ওঠে। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দায়িত্বের

গণ্ডির ভেতরে সংঘটিত মন্দ কাজের বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করে বলেছেন:

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيذان.

“তোমাদের কেউ যদি কোনো মন্দ কাজ হতে দেখে, তবে সে যেন হাত দিয়ে তা প্রতিহত করে। যদি তার সেই সাহস না থাকে, তবে যেন মুখ দিয়ে (কথা বলে তা প্রতিহত করে); আর যদি তাও করতে না পারে, তবে যেন অন্তর দিয়ে তা ঘৃণা করে। আর এটিই হলো ঈমানের দুর্বলতম স্তর।” (সহিহ মুসলিম, রেওয়ায়েত নম্বর:১৭৭)

মন্দ কাজ বোঝাতে এই রেওয়ায়েতে ‘মুনকার’ (مُنْكَر) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা সেসব অন্যায়কে বোঝানো হয়নি, যা নিছক ধর্মীয় আচারবিধান লঙ্ঘনের ফলে সৃষ্টি হয়; বরং এর দ্বারা ওইসব মন্দ কাজকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলোকে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতি মন্দ ও অন্যায় হিসেবে জানে। চুরি, মিথ্যাচার,

অসাধুতা, আত্মসাৎ, খিয়ানত, ওজন ও মাপে কম দেওয়া, ভেজাল মেশানো, অধিকার হরণ, অশ্লীলতা, জীবন-সম্পদ ও সম্ভ্রমের ক্ষতিসাধন এবং এ জাতীয় অপরাপর মন্দ কাজকে আরবি ভাষায় ‘মুনকার’ শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই বাণী মূলত উল্লিখিত সামাজিক ও নৈতিক অপরাধসমূহের সাথেই সম্পর্কিত। কুরআনে ‘আমর বিল মারুফ’ ও ‘নাহি আনিল মুনকার’-এর যে নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে, এই হাদিসটি তারই একটি শাখাগত বর্ণনা। তিনি সতর্ক করে বলেছেন: নিজের এখতিয়ারভুক্ত ক্ষেত্রের ভেতরে সংঘটিত এসব মন্দ কাজকে যদি কেউ অন্তর থেকেও ঘৃণা না করে, তবে এরপর আর ঈমানের কোনো স্তর অবশিষ্ট থাকে না।

এই রেওয়ায়েতে উল্লিখিত **فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ** (যদি না পারে) শব্দগুচ্ছের প্রকৃত অর্থ বোঝাটাও জরুরি। এর দ্বারা সেই সক্ষমতা বা সামর্থ্যকে বোঝানো হয়নি, যা মানুষকে কোনো কাজের জন্য দায়বদ্ধ করে; কেননা সেই সক্ষমতা না

থাকার কারণে কেউ যদি কোনো নির্দেশ পালন করতে না পারে, তবে এ কারণে সে ঈমানের কোনো নিম্নতর স্তরে নেমে যায় না। আলোচ্য রেওয়ায়েতে এই শব্দগুচ্ছ মূলত নৈতিক সাহস, আত্মিক শক্তি ও হিম্মতের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা অন্তরের ঈমানি শক্তি বা দুর্বলতার তারতম্যের কারণে কমবেশি হতে পারে। শুধু নিজের এখতিয়ারের পরিধিতেই কোনো ব্যক্তি যদি বস্তুগত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হাত দিয়ে কোনো মন্দ কাজ প্রতিহত না করে, তবে তার সম্পর্কে এটা বলা যাবে যে, ঈমানের প্রথম স্তরে সে ব্যক্তি অধিষ্ঠিত নয়; কেননা ক্ষমতা ও শাসনের অধিকার থাকা সত্ত্বেও সে মন্দ কাজ বন্ধের চেষ্টা করেনি। হাদিসটির অর্থ কখনোই এটা নয় যে, ঈমানের এই স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষ তাদের অনুসারীদের মাধ্যমে বাহিনী সংগঠিত করবে এবং মন্দ নির্মূলের নামে নিজ উদ্যোগে অভিযানে বের হবে। এ জাতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে তা সমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ও ফাসাদের জন্ম দেবে, যার কোনো সুযোগ ধর্মে নেই। ধর্মের প্রতিটি বিধানই মানুষের এখতিয়ার ও সাধ্যের

সীমা বিবেচনা করে দেওয়া হয়েছে। لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ — এক অকাট্য মূলনীতি, যা  
[২২] نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ধর্ম ও শরিয়তের সকল বিধানে বিবেচনায় রাখা  
হয়েছে। অতএব নাহি আনিল মুনকার সম্পর্কে  
রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর  
বাণীসমূহকেও এই মূলনীতির আলোকেই বোঝা  
উচিত।



---

২২ কুরআন, সূরা বাকারা, ২:২৮৬। অর্থ: “(বাস্তবতা হচ্ছে),  
আল্লাহ কারো ওপর তার সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপিয়ে দেন  
না।”

দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে আমরা এই ধর্মের ওপর ঈমান আনতে এবং এই ধর্ম মোতাবেক নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের আত্মশুদ্ধির আহ্বান জানাই। যারা এই আহ্বান কবুল করবে, তাদের প্রতিদান আল্লাহর জান্নাত, যার প্রশস্ততা পুরো মহাবিশ্বের প্রশস্ততার সমান; যেখানে জীবনের সাথে মৃত্যু, আনন্দের সাথে বেদনা, খুশির সাথে দুঃখ, প্রশান্তির সাথে অস্থিরতা, আরামের সাথে কষ্ট এবং নিয়ামতের সাথে আজাবের কোনো চিন্তা নেই; যার আরাম স্থায়ী, যার স্বাদ অসীম, যার দিন-রাত চিরন্তন, যার নিরাপত্তা অবিনশ্বর, যার আনন্দ অক্ষয়, যার সৌন্দর্য চিরস্থায়ী এবং পূর্ণতা সীমাহীন। আল্লাহতায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য এতে এমন কিছু প্রস্তুত রেখেছেন, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মানুষের হৃদয় তা কখনো কল্পনাও করেনি।

জাভেদ আহমেদ গামিদি